ষষ্ঠ অধ্যায়

মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন : উপন্যাস ও গল্পে তার প্রতিফলন

> এই রোগগ্রস্ত পৃথিবীতে, রোজ এই ভোরটুকুর জন্যই অমিতা প্রতীক্ষা করে থাকে। অমিতা জানে আজকের পৃথিবীও তারই মতো ক্যান্সারে ভুগছে। তবু এই ভোরটাকে তার মনে হয়, রোজ মনে হয়, এ-ই যেন নীরোগ আছে, ভোরটাকে সদ্য ভূমিষ্ঠ নধরকান্তি এক নিষ্পাপ শিশু বলে মনে হয় তার। আবার কখনও মনে হয়, এ যেন তার প্রথম প্রেমিক। মনে হয়, সে যেন চিরবিরহিনী রাধা আর এই ভোরটুকু তার কৃষ্ণ। অমিতা থরো থরো দেহটা নিয়ে, সারা রাত ধরে এরই প্রতীক্ষায় থাকে। [প্রতিবেশী, পৃ. ৩৯][১]

'প্রতিবেশী' উপন্যাসে অমিতার মনের এই ভাবনা আসলে আমাদের লেখক গৌরকিশোর ঘোষের আত্মকথন। মনঃসমীক্ষণগত 'সাইকোবায়োগ্রাফিকাল' পদ্ধতিতে বলা হয় যে, যে কোনো চরিত্রের জীবনের ধারণার কেন্দ্রীয় বীজটিই হল বিষয়ের মূলপাঠ, যা আসলে লেখকের অবচেতন মনের লক্ষণ। এর মধ্য দিয়ে পাঠক ও সমালোচকগণ পৌঁছে যান লেখকের অনুপ্রেরণার পটভূমিতে, উদ্দীপনা ও উন্মেষের আড়ালে এবং যুক্তি বুদ্ধির শিকড়ে। লেখক উপন্যাস ও ছোটোগল্পের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমরাও পৌঁছে যাব লেখকের যুক্তিবুদ্ধির শিকড়ে, অনুপ্রেরণার পটভূমিতে। গৌরকিশোর ঘোষ ত্রিলজি উপন্যাস তিনটি ১৯৬১-৬২ সালে লিখেছেন। কিন্তু উপন্যাস তিনটির প্রেক্ষাপটের সময়সীমাকে ১৯২২ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত বেছে নিয়েছেন। এছাড়া তাঁর উপন্যাস সমগ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে স্বাধীনতা পরবর্তী সমাজের অস্থিরতার মধ্যেকার মানুষের জীবনের নানা মানসিক দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে। শুধু উপন্যাসেই নয়, তাঁর গল্পগুলির বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে সমকালীন বিভিন্ন ঘটনার দ্বন্দ্ব ও মানসিক টানাপোড়েন ফুটে উঠেছে। তাঁর লেখায় সমকালীন সমাজ-রাজনীতি ধর্ম প্রতিটি বিষয় গভীরভাবে ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে বিশ্লেষিত হয়েছে। অমিতার আত্মকথনের মধ্য দিয়ে 'প্রতিবেশী' উপন্যাসটি বিশ্লেষিত হয়েছে। উপন্যাসটিতে দেখা যাচ্ছে অমিতার শরীরে কর্কটরোগ বাসা বেঁধেছে। ধীরে ধীরে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। এই ঘটনাটি আসলে লেখক প্রতীকী হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কারণ লেখক যে সময়ের ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে নানা ঘটনা সংঘাত পারম্পর্যের টানা পোড়েনের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজ ধীরে ধীরে ভেতর থেকে ক্ষয় হয়ে চলেছে। যার মোকাবিলা করা কোনো মানুষের পক্ষেই হয়তো সম্ভব নয়। কারণ তখন সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থা জুড়ে শুরু হয়ে গেছে বিভেদের রাজনীতি। শুধুমাত্র ধর্ম বা সম্প্রদায়গতভাবেই বিভেদ নয়, আবার একই সম্প্রদায়ের মধ্যে কার্যের ভিত্তিতেও এই বিভেদ লক্ষ করা যায়। শুধুমাত্র ভারতবর্ষের মজ্জার অভ্যন্তরেই এই কর্কটরোগে আক্রান্ত করেছে তাই নয়। সমগ্র পৃথিবীর মজ্জার অভ্যন্তরে কর্কট রোগ বাসা বেঁধেছে। যা ধীরে ধীরে সমাজকে ভিতর থেকে শূন্য করে দিচ্ছে। তাই উপন্যাসে অমিতা এই রোগগ্রস্ত পৃথিবীতে, রোজ 'এই ভোরটুকুর জন্যই অপেক্ষা করে থাকে। কারণ এই ভোরটুকুই হল সদ্য ভূমিষ্ঠ এক নিষ্পাপ শিশু'। যার মধ্যে রয়েছে আগামীর সম্ভাবনা। ঠিক যেমন ভাবে ভোরের নবকিরণ নতুন দিনের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু ধীরে ধীরে ভোরের উষার নব কিরণ মিলিয়ে যায় সূর্যের প্রখর দাবদাহে। ঠিক একই রকমভাবে নিষ্পাপ শিশুটিই মিলিয়ে যায় সমাজ-রাজনীতির অতল গহ্বরে। আবার 'প্রেম নেই' উপন্যাসে দেখি যে ফটিক আর ছবির সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগেই মারা গেছে। আর এই ঘটনাটির সাথে লেখক কংগ্রেস-প্রজা কোয়ালিশনের ঘটনাটি যুক্ত করে দিয়েছেন। সেই জন্যই ফটিককে বলতে শোনা যায়—

শিশুটি মারা গেছে ছবি।

কংগ্রস-প্রজা কোয়ালিশন মারা গিয়েছে। ভূমিষ্ঠ হতে পারেনি। [প্রেম নেই, পৃ. ৩৪১][২]

ব্যক্তিগত জীবনে লেখক মানবেন্দ্রনাথ রায়ের রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হলেও তাঁর সাহিত্য রচনার ধাপে ধাপে আমরা মার্কসবাদের প্রভাব লক্ষ করি। কারণ লেখকের জীবনদর্শনই প্রতিফলিত হয় সাহিত্যে ও শিল্পে। কোনো কোনো সমালোচকেরা বলেন যে—জীবন চর্চাই গড়ে তোলে জীবনদর্শন। আর তাই গৌরকিশোরের সাহিত্য সম্ভারে তাঁর জীবনচর্চার মধ্যে গড়ে ওঠা জীবন দর্শনই প্রতিফলিত হয়েছে। লেখক নিজের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়টাকেই বেছে নিয়েছেন তাঁর ত্রিলজি উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে। দুই বিশ্বযুদ্ধকালীন মধ্যবর্তীপর্বের সময়টা দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রজীবনের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ সময়। সারা দেশজুড়ে এক উত্তালময় পরিস্থিতি। একটি দেশে জরুরিকালীন পরিস্থিতি মানুষের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার ওপর প্রভাব ফেলে। যেমন প্রভাব ফেলেছিল গৌরকিশোরের জীবনে। তাঁর জীবন অভিজ্ঞতা বা তৎকালীন সময়ের জিজ্ঞাসু মানসিকতা প্রতিফলিত হয়েছে, যথাক্রমে—'জল পড়ে পাতা নড়ে' ; 'প্রেম নেই' ; 'প্রতিবেশী' উপন্যাসগুলিতে। বিপ্লবের মধ্য দিয়ে মানুষ যে শিক্ষা নেয় এবং তার ফলে তাদের মানসিকতার যে পরিবর্তন হয়, তারই প্রতিফলন হয় সাহিত্যে।সেই বিষয়ে ব্যতিক্রম নয় গৌরকিশোর ঘোষের সাহিত্যগুলি। লেখকের কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তীর্ণ হবার সময় ভারতীয় রাজনৈতিক জগতে মানবেন্দ্রনাথ রায় হলেন একজন সবচেয়ে বেশি আলোচিত ব্যক্তিত্ব। সমালোচকেরা মনে করেন এম. এন. রায়-এর জীবন ও মনন ধারা মোটামুটি তিনটি পর্যায়ে বিবর্তিত হয়েছে। জাতীয়তাবাদ থেকে মার্কসবাদের মধ্য দিয়ে ক্রমে তিনি নবমানবতাবাদে উপনীত হয়েছেন। নবমানবতাবাদ হল তাঁর ব্যক্তি জীবনের অর্জিত বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনন্য জ্ঞানেরই পরিণতি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার প্রতিফলনগুলিই হয়তো ত্রিলজি উপন্যাস তিনটির মধ্যে দিয়ে লেখক প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেছেন বলে মনে হয়। লেখক নিজে ধীরে ধীরে মার্কসবাদের সাথে জড়িয়ে পড়তে থাকেন। স্বাধীনতা পরবর্তী যে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের আন্দোলন, নকশালবাড়ির আন্দোলন, হাংরি আন্দোলন প্রভৃতি আন্দোলন গুলো লেখকের জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। তারই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় উপন্যাস সংগ্রহের উপন্যাসগুলির মধ্যে এবং গল্প সংগ্রহের গল্পগুলির মধ্যে। যে কোনো আন্দোলন সমাজে বসবাসকারী বিভিন্ন স্তরের মানুষের মনে কম-বেশি প্রভাব বিস্তার করে, যা তাদের জীবন যাত্রাকে প্রভাবিত করতে থাকে। যেমন—প্রভাবিত করেছিল ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লব। যার চরম পরিণতি ১৭৮৯-১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দের ফরাসি বিপ্লব এবং শিল্প বিপ্লব। যার আঁচ এসে পড়েছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে। কারণ ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লবের সুফল সীমাবদ্ধ ছিল সকল দেশের কিছু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে। তারাই ভোগ করতে লাগল সকল রকম সুযোগ সুবিধে এবং পাণ্ডিত্যের বিকাশও তাদের মধ্যেই দেখা দিতে লাগল। শিল্প বিপ্লবের সুফল সাধারণ জনগণের মধ্যে প্রভাব পড়তে দেখা যায়নি। তার ফলে সকল দেশের বেশিরভাগ মানুষ ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশের সুফলের বাইরে। তাদেরকে এক দুঃখ-যন্ত্রণার ও অজ্ঞতার অন্ধকারে জীবন কাটাতে হয়েছিল। এই রকম পরিস্থিতিতে ধর্ম পরিণত হয়েছিল অন্ধ কুসংস্কার এবং অর্থহীন আচার বিশ্বাসের অনুষ্ঠানে। একাধারে ধর্মীয় গোঁড়ামিই বিবেচিত হল যথার্থ ধর্ম হিসেবে। এরই সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয় সকল দেশের ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল মানুষকে প্রভাবিত করেছিল। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আর্থিক বৈষম্য, সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত বিদ্বেষ। আবার শিল্পবিপ্লবের ফলে শিল্প কারখানার অনশন পুষ্ট শ্রমিক এবং শস্যক্ষেত্রের নিপীড়িত কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের ঘটনা লক্ষ করা যায়। এর কিছুকাল পরে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় নিপীড়িত কৃষক ও শিল্প শ্রমিকদের মধ্যেও একই ধরনের আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ করা গিয়েছিল। সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক বিশেষ করে ধর্ম-যুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর মনঃসমীক্ষণবাদের প্রবর্তক সিগমুন্ড ফ্রয়েড তাঁর ভাবনাচিন্তা প্রকাশ

করেছেন। তিনি এসেই মনঃসমীক্ষণবাদের সম্পূর্ণ নতুন তথ্যের সংযোজন ঘটান। তখন থেকেই ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব চেতন-অবচেতন মন সম্বন্ধীয় বিশ্বাসের প্রতিবেদক হিসেবেই প্রতিফলিত হয়, বিশেষ করে সাহিত্যের ক্ষেত্রে। ফ্রয়েড মনে করতেন, ব্যক্তির সব কাজই যে চেতন মন দিয়ে নির্ধারিত হয় তা নয়, অবেচতন মনের সহজাত প্রবৃত্তির তাগিদে নির্দিষ্ট ভঙ্গিতে তার আচরণের কাঠামো তৈরি করে থাকে। ফ্রয়েড কথাশিল্পীদের দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। তিনি প্রথমভাগে সেই সমস্ত লেখকদের রেখেছেন, যাঁরা ট্রাজেডির লেখক। তাঁরা লেখার উপকরণ হিসেবে জনমনে প্রতিষ্ঠিত কোনো কাহিনিকে ব্যবহার করেন। আর দ্বিতীয়ভাগে রয়েছে সেই সমস্ত লেখকেরা যাঁরা কাহিনির উদ্ভাবক। এই প্রসঙ্গের সূত্র ধরেই অনেক সমালোচক মনে করেন যে, ফ্রয়েড যে দ্বিতীয় শ্রেণির কাহিনি উদ্ভাবক লেখকদের কথা বলেছেন, সেই সমস্ত লেখকের রচনায় একজন Hero তথা বর্ণনীয় ব্যক্তির উপস্থিতি অবশ্যই থাকবে। তাকে ঘিরেই কাহিনি আবর্তিত হবে এবং তাকে কাহিনি শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখবে লেখক। যদি কাহিনী শুরুতেই দেখা যায় যে প্রধান চরিত্র বাস্তবের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত অচৈতন্য, দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনায় সে আরোগ্যের পথে,শুশ্রুষা অভিষিক্ত। এইরকম কাহিনির সন্নিবেশ লক্ষ করা যায় কথাশিল্পী গৌরকিশোর ঘোষের ত্রিলজি উপন্যাস তিনটির মধ্য দিয়ে। বিশেষ করে 'প্রতিবেশী' উপন্যাসটিতে ফ্রয়েডের কথাশিল্পের বৈশিষ্ট্যের অনুসারী বলা যেতে পারে। 'প্রেম নেই'উপন্যাসের মধ্যে তার কিছুটা ছাপ স্পষ্ট।

'প্রতিবেশী' উপন্যাসে 'অমিতা' চরিত্রের প্রতিদিনের নৈরাশ্য, অবহেলা, অপমান, অবসাদের মধ্যে ক্ষণকালের জন্য হলেও জীবনের সুকঠিন বাস্তবতা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে সে আশ্রয় নেয় দিবাস্বপ্নে। ফ্রয়েড যেমন বলেছিলেন—স্বপ্ন যেমন আমাদের বাসনার চরিতার্থতা, দিবাস্বপ্নও ঠিক তাই। স্বপ্ন আর দিবাস্বপ্নের মধ্যে শুধু প্রকৃতিগত নয় ভাষাগত সাদৃশ্যও আছে। স্বপ্নের মতো দিবাস্বপ্নও প্রকাশ্য নয়, ব্যক্তিমনের উচ্চাশা কিংবা সলজ্জ গোপনীয়তা দিবাস্বপ্নে কল্পনাবাহিত স্ফূর্তিলাভ করে। যা আমরা অমিতা চরিত্রের মধ্যে সবচেয়ে বেশি করে লক্ষ করে থাকি। উপন্যাসটির শুরুতেই লেখক অমিতার বর্তমান অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—'ফুলকি তো কবেই মরে গিয়েছে। এখন যে বেঁচে আছে, এখনও যে বেঁচে আছে, সে অমিতা, শামিম যাকে সম্বোধন করত ফুলকি বলে'। অমিতার শরীরে ক্যানসার বাসা বেঁধেছে। যা তাকে কুরে কুরে আন্তঃসারশূন্য করে ফেলেছে। আজ অমিতার পাশে আপনজনেরা কেউ নেই শুধুমাত্র আছে মন্টুর মা। যে তাকে দেখাশুনা করে। এই রকম পরিস্থিতিতে অমিতা স্বপ্ন দেখে একটি আশ্রয়ের। লেখক তার বর্ণনা দিয়েছেন—

> অমিতা ভিজেসপসপে বিছানায় শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখে এমন একটা আশ্রয়ের যেখানে একা থাকতে হবে না তাকে। কেউ, সে যে কেউই হোক, একজন থাকবে তার ঘরে, তার কাছে। যার উষ্ণতা সে অনুভব করবে। ওল্ডহোম, নবনীড়, মাদার টেরিজা, যেখানে হোক, যে আশ্রয়েই হোক, অমিতাকে চলে যেতেই হবে। এ অসহ্য, এ জীবন অসহ্য, অসহ্য অসহ্য, অসহ্য। (প্রতিবেশী, পৃ. ১৬)[৩]

এই স্বপ্নের মধ্য দিয়ে অমিতার মনের গোপনীয় ভাবনা কল্পনাবাহিত হয়ে স্ফূর্তিলাভ করেছে। এমত অবস্থায় অমিতার চোখে আবছা হয়ে ভেসে উঠতে লাগল 'সেইসব যুবকের ছবি যারা কোনও না কোনও সময়ে ছিল তার অন্তরঙ্গ সঙ্গী। কখনও বা প্রেমিক।'[৪] (পৃ. ১৭) কিন্তু অমিতা আশ্চর্য হয়ে গেল এই ভেবে যে, এই মুখগুলোর মধ্যে চারটে মুখ সে দেখতে পেল না। সে মনে মনে ভাবতে লাগল কোথায় গেল সমীরেন্দ্র, তার প্রথম স্বামী? কোথায় গেল যোগীশ্বর, তার দ্বিতীয় স্বামী? লোকনাথ, লোকনাথও কেন অনুপস্থিত? লোকনাথ তার তৃতীয় স্বামী। অমিতার এই সমস্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে ফ্রয়েড যে দিবাস্বপনের মধ্যে যে অতৃপ্ত ইচ্ছা পূরণের কথা বলেছেন তা কিন্তু প্রত্যক্ষ করা যায়। শুধুমাত্র 'প্রতিবেশী' উপন্যাসে অমিতাই দিবাস্বপ্ন দেখেনি, 'প্রেম নেই' উপন্যাসে ফটিক ওরফে শফিকুলও দিবাস্বপ্ন দেখেছে। অমিতা ও শফিকুলের মধ্যে পার্থক্য এখানে একজন স্বপ্ন দেখেছে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের

অপ্রাপ্তির ইচ্ছাপূরণের কথা ভেবে। আর অন্যজন দেখেছে নতুন সমাজ ব্যবস্থা গঠন হবে, যাতে করে সমাজে যারা বঞ্চিত তারা তাদের ন্যায্য অধিকার পাবে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির এক সংকটঘন মুহূর্ত সেই সংকটের মধ্যে দাঁড়িয়েও শফিকুলকে শেষবারের মতো আশঙ্কিত হতে দেখা যায়। কারণ সে মনে করেছিল কংগ্রেস আর কৃষক প্রজাপার্টির মধ্যে কোয়ালিশনের সম্ভাবনা সংকটকে দূর করতে সাহায্য করবে। কারণ কংগ্রেসের দাবি ছিল সরকার গঠন করেই প্রথমে সমস্ত রাজবন্দিদের বিনাশর্তে মুক্তি দিতে হবে এবং প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন করে জমিদারের হাত থেকে কৃষকদেরকে মুক্ত করাই ছিল কৃষক-প্রজা পার্টির প্রধান দাবি। কিন্তু দুই দলের মধ্যে কোন্ মতকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, এই নিয়ে একমত হতে না পারায় কোয়ালিশানের সম্ভাবনা শেষ পর্যন্ত ধূলিসাৎ হয়ে যায়, এই সিদ্ধান্তের ফলে শফিকুল এবং শফিকুলের মতো মানুষেরা হতাশ ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত শফিকুল তার ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক হতাশার মধ্যে যেন আর কোনও সীমারেখা দেখতে পায় না। তাই উপন্যাসের শেষে তাকে বলতে শোনা যায়—

> ''শিশুটি মারা গিয়েছে ছবি। সে আর ফিরবে না।
>
> ... ...
>
> তুমি দোষী নও ছবি। আদৌ দোষী নও। সব দুঃখের পেছনে একজন দোষীকে থাকতেই হবে, একথা তোমাকে কে বলল ছবি? যে সব ঘটনায় আমরা শোক পাই তাপ পাই, প্রচণ্ড আঘাত পাই, সব সময়েই কি তা কারও দোষে ঘটে ছবি? না ছবি, তুমি শান্ত হও। তুমি দোষী নও। মুখে ফটিক একটা সান্ত্বনার কথাও ছবিকে বলতে পারে না। সে বোবা হয়ে যায়। কথাগুলো এত হাল্কা লাগে যে তার আর বলতে ইচ্ছে হয় না। তার জন্য যন্ত্রণা পায়।
>
> শিশুটি মারা গেছে ছবি।
>
> কংগ্রেস-প্রজা কোয়ালিশন মারা গিয়েছে। ভূমিষ্ঠ হতে পারেনি। কিন্তু তার জন্য কাকে দোষী করব আমি? হক সাহেবকে? কংগ্রেসকে? কাকে?
>
> একটা তীব্র যন্ত্রণা অস্থির করে তুলেছে ফটিককে। [পৃ. ৩৪১][৫]

অন্যদিকে 'প্রতিবেশী' উপন্যাসে অমিতার নিঃসঙ্গ প্রহরের স্মৃতিচারণে ভিতর দিয়ে যে যুগটা ধরা পড়েছে, তার রাজনৈতিক আবহ ক্রমে কেমন করে পারস্পরিক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে মত্ত হয়ে উঠল, সেই ইতিহাসই যত্ন করে বর্ণনা করেছেন তাঁর উপন্যাসটিতে। অমিতার দুরারোগ্য ক্যানসারকে উপন্যাসটিতে একটি প্রতীকী হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন কীভাবে বাংলা তথা সারা ভারতের রাজনীতি ধীরে ধীরে দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছে। উপন্যাসটির ভূমিকায় গৌরী আইয়ুব লেখকের অন্তর উপলব্ধিকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং তার পাশাপাশি একটি প্রতীকীকে তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে। তিনি বিষয় দুটিকে বিশ্লেষণ করেছেন—

> একটি মাত্র চরিত্রের সাহায্যে তখনকার জটিল রাজনৈতিক চিত্রটিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠার দুঃসাধ্য দায়িত্ব নিজের উপর আরোপ করেছিলেন লেখক। অমিতার স্মৃতিতে ভিড় করে আসা মানুষগুলি তো তখন ছায়াছবি।তারই প্রেক্ষিতে একটি সংরক্ত প্রেমের কাহিনীও বুনে গিয়েছেন গৌরকিশোর। শামীম আর অমিতার সেই প্রেম যখন পারিবারিক আর রাজনৈতিক ধাক্কায় বিপর্যস্ত সেই সময়ে ভুল বোঝাবুঝির অবসান করার আশায় অমিতাকে একদিন প্যারাগনে আসতে বলেছিল শামীম। কিন্তু দিনটা হল ১৬ই আগস্ট, ১৯৪৬। সেদিন কলকাতায় ডিরেক্ট অ্যাকশান যে কী চেহারা নেবে তা ওরা কেউই বুঝতে পারেনি। অমিত সেদিন প্যারাগনে পৌঁছতে পারেনি। শামীম কি পেরেছিল? কে জানে? এর পরে তো চির-বিচ্ছেদ। আরও ঠিক এক বছর পরে ভারত-পাকিস্তানের বিচ্ছেদ ঘটল। এটাও প্রতীকী কিন্তু যন্ত্রণাটা তো মিথ্যা নয়।'' [প্রতিবেশী, ভূমিকা][৬]

গৌরকিশোর ঘোষের ত্রিলজি উপন্যাস তিনটিকে শুধুমাত্র ফ্রয়েডের স্বপ্ন ও দিবাস্বপ্ন তত্ত্ব দ্বারা বিশ্লেষণ করলেই যথোপযুক্ত বিশ্লেষণ হবে না। সেই সঙ্গে ফ্রয়েড যে মানব মনের বিভিন্ন স্তরের কথা বলেছেন, তা আমরা রেখাচিত্রের

মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করব এবং তার মধ্য দিয়ে গৌরকিশোর ঘোষের উপন্যাস ও গল্পের চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিকতা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। তার পাশাপাশি আমাদের বিশ্লেষণের বিষয় লেখকের সমাজ মনস্তাত্ত্বিকতা (Social Psychology)।

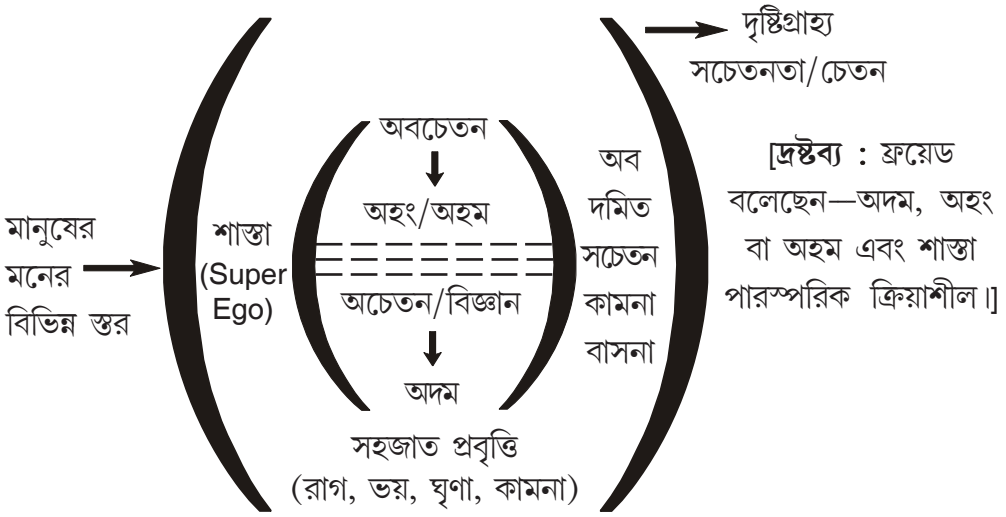

রেখাচিত্রটি ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণবাদের সূত্রধরে মানবমনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[৭]

রেখাচিত্র-১

মানবমনের অচেতন অবস্থার অতলে লুকিয়ে থাকে যে সব প্রবৃত্তি, যথা—রাগ, ভয়, ঘৃণা, কামনা সেগুলিই বিভিন্ন সময় নানা জটিল প্রক্রিয়ায় উঠে আসতে চায় মনের সচেতন স্তরে। যা আমরা গৌরকিশোর ঘোষের উপন্যাস ও গল্পগুলির বিভিন্ন চরিত্রগুলির মধ্যে লক্ষ করি। যেমন—'জল পড়ে পাতা নড়ে' উপন্যাসের গিরিবালা, ভূষণ চরিত্রের মধ্য দিয়ে, 'প্রেম নেই' উপন্যাসের ছবি ও ফটিক এবং 'প্রতিবেশী' উপন্যাসের 'অমিতা', 'লোকটা' উপন্যাসে লোকটা, 'এই দাহ' উপন্যাসে গোলক মজুমদার, 'এক ধরনের বিপন্নতা'য় শীতল, 'তলিয়ে যাবার আগে' গল্পে অমিত ও লিলি প্রমুখ চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ যেমন শহর থেকে গ্রামে আছড়ে পড়েছিল। কিন্তু আন্দোলনের আঁচ গিয়ে পড়েছিল গ্রামের মানুষগুলির মধ্যে। যা স্বাধীনতা পরবর্তী নকশাল আন্দোলনে শ্লোগান হয়ে দাঁড়িয়েছিল 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা', তবেই আন্দোলন সংঘটিত হবে এবং সফলতা অর্জন করতে পারবে। শেষ পর্যন্ত নকশাল আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল। ঠিক একইরকমভাবে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের আন্দোলনগুলোও কোনো না কোনো সময় ব্যর্থ হয়েছিল। তার প্রধান কারণই ছিল জাতীয়তাবাদী শিক্ষিত শহুরে নেতারা গ্রামের আন্দোলনকে সংগঠিত করতে পারেনি। যার ফল হয়েছিল মারাত্মক এবং বিলম্বিত লয়ে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি। দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণির উত্থান ও তাদের আধিপত্যে প্রলেতারিত শ্রেণির অবস্থান হয়ে উঠেছিল সঙ্গীন। ধীরে ধীরে ভারতের শহর-মফস্বল ও গ্রামে পুঁজিবাদের উদ্ভব হতে থাকে। আর এই পুঁজিবাদের উদ্ভবের ফলে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এছাড়া পুঁজিবাদের উদ্ভবের ফলে সমাজে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের উদ্ভব হয়েছে। সামাজিক পরিবর্তনের ফলে শুধুমাত্র সমাজের রীতিনীতি, ধর্মীয় আচার আচরণেরই পরিবর্তন হয় না, সেই সঙ্গে সমাজে অবস্থিত মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মধ্যেও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সমাজ কাঠামাতে পরিবর্তন হলে ব্যক্তির একক উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক হয়ে ওঠে। এই ঘটনার চূড়ান্ত প্রতিফলন লক্ষ করা যায় তৎকালীন ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির ক্ষেত্রকে ঘিরে। ১৯২১-২২ সালে বিশ্বরাজনীতির পরিস্থিতিও ছিল উত্তালময়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গেছে। এই যুদ্ধে ব্রিটেনকে অর্থনৈতিক দিক থেকে নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। তখন থেকেই ইংরেজ উপনিবেশের লক্ষ হয়ে দাঁড়ায় উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতি আস্থা প্রদর্শন। ১৯১৬ সালে ব্রিটিশ সরকার 'Indian Industrial Commission' গঠন করেন এবং একই সঙ্গে ভারতের জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াশ্রেণির ক্রমবর্ধমান শক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে তারা

'মন্টেগু-চেমসফোর্ড' শাসন সংস্কারের ব্যবস্থা করে। এই ঘটনার কিছু পরে ১৯২৬ সালে ভারতীয় রাজনীতির পটপরিবর্তনে এই ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছিল। সেই সময় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে হোমরুল আন্দোলন ও স্বরাজ্য দলের বৈপ্লবিক অস্তিত্বের অবসান ঘটে। ইংরেজরা সেই সুযোগে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণিকে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ও শিল্পোন্নয়নের আধিপত্যের সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এই সুযোগে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি নিজেদের কাজ হাসিল করার জন্য সাধারণ মানুষকে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদানের কথা বলতে থাকে। কিন্তু তারা বুঝতে পারে না যে, ইংরেজদেরকে ভারত থেকে তাড়াতে অর্থাৎ ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির সংঘবদ্ধ সংগ্রামের উপর নির্ভরশীল। শেষ পর্যন্ত দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণি ইংরেজদের সঙ্গে হাত মেলালেন। অন্যদিকে সমাজে যারা প্রলেতারিয়েত অন্ত্যজ শ্রেণি তারা ক্রমশ বঞ্চিত হতাশের দলে অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে।

এই প্রসঙ্গের সূত্র ধরে ইতালির কমউনিস্ট নেতা ও দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামশির মন্তব্যগুলিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তিনি সমাজ কাঠামোকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করেছিলেন।

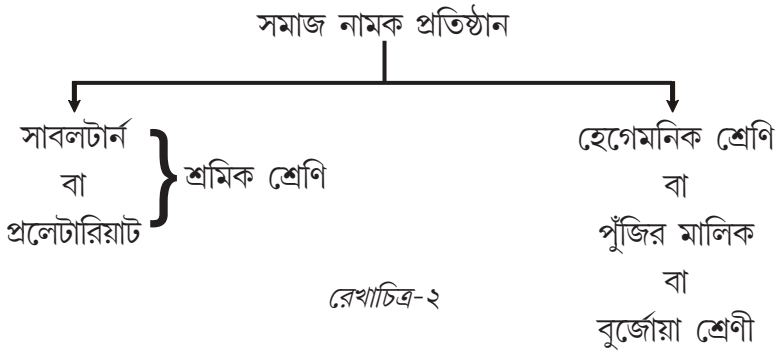

রেখাচিত্র-২

গ্রামশি সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, সমাজে বুর্জোয়াশ্রেণি কেবল শাসন যন্ত্রে তার প্রভুত্বই প্রতিষ্ঠা করে না, সৃষ্টি করে এক সার্বিক সামাজিক কর্তৃত্ব বা হেগেমনি। গ্রামশির বিশ্লেষণে আরেকটি বিষয় বিশেষ করে গুরুত্ব পায়, সেটি হল রাষ্ট্রের সঙ্গে বৃহত্তর নাগরিক সম্পর্ক। যেখানে জাতি, জনগণ, বুর্জোয়াশ্রেণি ও অন্যান্য শাসক গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক এছাড়া জাতীয় জীবনের একচ্ছত্র প্রতিনিধি হিসেবে জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয়গুলি। গ্রামশি সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে বিশ্লেষণ করেছেন তা শুধুমাত্র ইতালীয় সমাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও যথার্থ বলেই মনে হয়।

ভারত তথা বাংলাতেও এই পুঁজিবাদী শ্রেণির উদ্ভব ঘটিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার নিজেদের স্বার্থে। এর ফলে গ্রামে গঞ্জে কৃষক শ্রেণির উপর পুঁজিবাদী শ্রেণির শোষণ হয়ে উঠেছিল মারাত্মক। তার পাশাপাশি চলছিল দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম। এই দুইয়ের ফলেই গ্রামের মানুষের জীবনে নেমে আসতে থাকে অন্ধকার। ধীরে ধীরে গ্রাম পতনের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু এরই মধ্যে প্রগতিশীল জনগোষ্ঠী ক্রমেই জেগে উঠতে থাকে। তৎকালীন গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ মানুষের বিপ্লবী চেতনার জাগরণ লক্ষ করা যায়। কিন্তু কিছু স্বার্থান্বেষী পুঁজিবাদী শ্রেণি নিজেদের স্বার্থে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের কাজে লাগিয়ে, ইংরেজদের সাথে হাত মিলিয়ে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে অখণ্ড ভারতকে খণ্ডিত করেছিল। সমাজ চেতনার পাশাপাশি পুঁজিবাদী শ্রেণির উদ্ভব এবং ধর্মকে সামনে রেখে বিভেদের রাজনীতিকে উস্কে দেওয়া তৎকালীন নানা ঘটনা বিবৃত হয়েছে গৌরকিশোর ঘোষের উপন্যাস ও গল্পগুলিতে।

গ্রামশির উচ্চবর্গ বা নিম্নবর্গের ধারণাটি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সমাজতাত্ত্বিক পার্থ চট্টোপাধ্যায় যে কথাগুলি বলেছেন তা আমাদের বিষয়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক বলেই মনে হয়েছে—

> বুর্জোয়াশ্রেণীর সামাজিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা কোনও একটি সুনির্দিষ্ট উপায়ে ঘটেনি। বরং পুঁজিবাদের উত্তরণের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটির অন্তর্গত যে শ্রেণী সংগ্রাম, তার বিশিষ্ট রূপ, শ্রেণীতে শ্রেণীতে বৈরিতা, মৈত্রী, সমঝোতার বিশিষ্ট রাজনৈতিক চেহারা, এক এক দেশে এক এক ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এবং সম্ভাবনার এই বিভিন্নতার কারণ সমাজ কাঠামোর বিভিন্ন অংশে দ্বন্দ্বের অসম বিকাশ। [নিম্নবর্গের ইতিহাস, পৃ. ৬][৮]

ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রেও শ্রেণি সংগ্রাম, শ্রেণিতে শ্রেণিতে বৈরিতা এবং সমঝোতার কথাই বেশি করে শুনতে পাওয়া যায়। এর পাশাপাশি ধর্মকে সামনে রেখে সমাজে নারী-পুরুষের অবস্থানের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করা হয়েছে এবং নারীকে পুথিগত শিক্ষার অঙ্গন থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। নানা কুসংস্কারে নারীদের জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছে। নারীদেরকে এই রকম বন্দীত্বময় জীবন থেকে মুক্ত করার জন্য বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অপর অংশ ছিল এর বিরোধী মতে বিশ্বাসী। তারা মানুষ-মনুষ্যত্ব মানবিকতার ঊর্ধ্বে জাত-পাত-ধর্মকে স্থান দিয়েছে বেশি করে। সেই রকমই দুটি চরিত্র হল 'প্রতিবেশী' উপন্যাসের 'শামিম' ও 'অমিতার বাবা'। একজন প্রগতিশীলতার পক্ষে আরেকজন মানুষ শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের হয়েও জাত-পাত-ধর্মের বেড়াজালে আবদ্ধ। গৌরকিশোর ঘোষের উপন্যাস ও গল্পে রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি স্থান পেয়েছে। রাজনৈতিক ঘটনাক্রম বা রাজনৈতিক বিষয়ক্রম বিশ্লেষণ করাই এই অধ্যায়ের মূল বিষয় নয়। রাজনৈতিক ঘটনাক্রমের গভীরে লুকিয়ে থাকা ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্য এবং সমাজের উচ্চবৃত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলি বিশ্লেষণ করাই হল এই অধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য।

এর পাশাপাশি আমরা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব লেখকের ত্রিলজি উপন্যাস তিনটির অধ্যায় বিভাজনের নামকরণের মধ্যে যে লেখকের গভীর মনস্তত্ত্ব লুকিয়ে আছে, সেই সূক্ষ্ম বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। কারণ যার মধ্য দিয়ে তিনি দেখাতে চেয়েছেন ধর্ম-জাতপাত-সমাজেনারীর অবস্থান এবং স্বাধীনতা সমসাময়িক ও স্বাধীনতা পরবর্তী যৌন মনস্তাত্ত্বিকতাকে। লেখক মানবিকতার মৌলিক ভাবনা এবং প্রথাগত বোধ ও বিশ্বাসকে নানাভাবে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। যেমন—'জল পড়ে পাতা নড়ে' উপন্যাসটিকে লেখক দুটি পরিচ্ছেদে ভাগ করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদটির নাম দিয়েছেন 'দুরন্ত ধারা'। আর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটির নাম দিয়েছেন 'হাওয়া এলোমেলো।' 'দুরন্ত ধারা' পরিচ্ছেদটি শুরু হয়েছে কুড়োনের মার শনিবারে, আমাবস্যেতে বারবেলায় ভর সন্ধেতে পুকুড় ঘাটে যাওয়ার ঘটনার মধ্য দিয়ে। এই ঘটনার মধ্যেই লুকিয়ে আছে গ্রামের অন্ধ সংস্কার। গ্রামের বিভিন্ন পরিবারের ঘটনার মধ্য দিয়ে কাহিনি এগিয়ে যেতে থাকে। গ্রামটিতে হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থান লক্ষ করা যায়। গ্রামের সবচেয়ে সম্মানীয় ব্যক্তি হলেন মেজোকর্তা, তিনি 'বেহ্মজ্ঞানী'। তিনি গ্রামের এবং নিজের পরিবারে অন্ধ সংস্কার দেখে ভীত ও সংশয়ান্বিত। তাই তাকে বলতে শোনা যায়—

> পৃথিবীর কত দ্রুত যে পরিবর্তন হচ্ছে, তার কোনও খবর এদের কানে পৌঁছোয় না। তিরিশ বছর আগেও এদের ধ্যান-ধারণা যা ছিল, এখও তাই-ই আছে। [পৃ. ২২] [৯]

অর্থাৎ এটি আসলে মেজোকর্তার কথা নয়, কথাটি আসলে আমাদের লেখকের। লেখক আসলে মেজোকর্তার মুখ দিয়ে কথাটি বলেছেন পাঠকদেরকে। কারণ লেখক বাস্তব ক্ষেত্রে দেখেছিলেন বিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও গ্রামগুলি কতটা অন্ধ সংস্কারে ডুবে আছে। এই প্রসঙ্গে 'মনঃসমীক্ষণগত সাইকোবায়োগ্রাফিকাল' পদ্ধতি বেশি প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছে। গিরিবালা-ভূষণের সরল দাম্পত্য জীবন তার পাশাপাশি গ্রামের হিন্দু-মুসলমানদের সম্পর্কের মধ্যে নানারকম টানাপোড়েন এবং দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ঘিরে দেশের নেতাদের নানা ধরনের চুক্তি ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের দলীয় রাজনীতিতে তাঁর ভূমিকা এবং দেশের প্রতি তাঁর কর্তব্য প্রভৃতি নানা ঘটনার ধারা নিয়ে 'দুরন্ত ধারা' পরিচ্ছেদটি এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এরপর থেকেই সমস্ত হাওয়া এলোমেলো হতে শুরু করে। সমাজের গভীরে লুকিয়ে থাকা নানান দিক উঁকি দিতে থাকে। তার মধ্যে সেই রকম একটি দিক পণপ্রথা। উপন্যাসে দেখা যায় পণপ্রথার জন্য চম্পির বিয়ে হচ্ছে না। একটি শিশু যখন হাত-পায়ে ভর দিয়ে হামাগুড়ি দেয় তখন সেটা শিশুটির কাছে অনেক নিরাপদ বলে মনে হয়, দু পায়ে ভর দিয়ে হাঁটার থেকে। ঠিক একই রকমভাবে স্বাধীনতা আন্দোলন যখন ধীরে ধীরে জোরালো হতে শুরু করে,সেই মুহূর্তে দেখা দেয় নানা রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতাদর্শগতভাবে পার্থক্য। তার ফলে নিজেদের মধ্যে মতভেদ বা মতান্তর হয়েই চলেছে। ফলে ইংরেজদেরকে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের তোষণ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়, ইংরেজদের সাথে নানা চুক্তি হতে থাকে। কিন্তু এরই মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু সমস্ত কিছুকে এলোমেলো করে দেয়। আর এই সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই হয়তো

লেখক এই পরিচ্ছদটির নাম দিয়েছেন 'হাওয়া এলোমেলো।' অন্যদিকে 'প্রেম নেই' উপন্যাসটিকে তিনটি পরিচ্ছেদে ভাগ করে, তিনটি নামকরণ করেছেন লেখক। প্রথমটির নাম দিয়েছেন 'আওরতে হাসিনা', দ্বিতীয়টির নামকরণ হয়েছে 'মধ্যিখানে চর'। আর তৃতীয়টির নাম হয়েছে 'দিগন্তে কালবৈশাখী'। 'আওরতে হাসিনা'র মধ্য দিয়ে লেখক দেখাতে চেয়েছেন বিশেষ করে মুসলিম সমাজে নারীর অবস্থানকে মুসলিম সমাজপতিরা অন্ধ সংস্কারের বেড়াজালে কীভাবে মেয়েদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে এবং তাদেরকে শিক্ষার আলো থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। এরই মধ্যে আমরা লক্ষ করেছি নারী-পুরুষের সম্পর্কের টানাপোড়েন ও তার মনস্তাত্ত্বিকতা। 'মধ্যিখানে চর' পরিচ্ছেদটির মধ্য দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন তৎকালীন সময়ে বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম অবস্থান, গ্রামভাগ, মুসলিম সমাজের নারী অগ্রগতির বিষয়, ১৯৩৫ সালের নির্বাচন, ঢাকার শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায়ের আত্মজাগরণ, হিন্দু-মুসলমান প্রজা আন্দোলন। আন্দোলন সম্পর্কে নেতাদের অবস্থান এছাড়া রয়েছে সম্পর্কে জটিলতা। একটি নদীর জল যেমন ধীরে ধীরে শুকিয়ে চড় পড়তে থাকে, ঠিক একইরকমভাবে স্বাধীনতা আন্দোলন গ্রামগুলিকে ভাগ করে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা বিভেদের চড় সৃষ্টি করেছিল রাজনৈতিক নেতারা। আবার পরবর্তী পরিচ্ছেদের নাম লেখক দিয়েছেন 'দিগন্তে কালবৈশাখী' অর্থাৎ স্বাধীনতা আন্দোলন যে ধীরে ধীরে জটিল আকার ধারণ করে চলেছে। হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের মধ্যে ভাঙন তৈরি হয়েছে যার ফলে আন্দোলনগুলো অন্যমাত্রা ধারণ করেছে। জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ নিজেদের নিজেদের দাবিদাওয়া নিয়ে ব্যস্ত এবং তারা নিজেদের নিজেদের জায়গায় স্থির। ফলে হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে সন্ত্রাস তৈরি হয়েছে। কংগ্রেস-প্রজা কোয়ালিশন গঠন হওয়ার আগেই ভেঙে গেছে। অর্থাৎ এই সমস্ত দিকগুলোকে বিশ্লেষণ করে লেখক এই রকম একটি নামকরণ করেছেন। এক্ষেত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব অপেক্ষা ইয়ুং-এর তত্ত্ব বেশি প্রাসঙ্গিক বলেই মনে হয়। কারণ ইয়ুং মানবমনের দুটি অচেতন স্তরের কথা বলেছেন। তার মধ্যে প্রথম স্তরটি এক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য বলে মনে হয়। কারণ ব্যক্তিগত অচেতন। যার আধেয় সংগৃহীত হয় ব্যক্তির জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে। এছাড়া 'প্রতিবেশী উপন্যাসটিকে তিনি দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। কিন্তু বিশেষ কোনো নামকরণ অধ্যায় দুটিতে করেননি। তবে 'প্রতিবেশী এই নামকরণটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, উপন্যাসটি যে সময়ের প্রেক্ষাপটে লেখা সেই সময়ের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের কথাকে। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় প্রতিবেশী হয়েও, প্রতিবেশীর মতো থাকতে পারল না। আর সেই বিষয়টিকে লেখক দেখিয়েছে অমিতা (ফুলকি) ও শামিমের সম্পর্কের ভাঙনের মধ্য দিয়ে। শুধুমাত্র এই তিনটি উপন্যাসই নয়। লেখকের উপন্যাস সংগ্রহের উপন্যাসগুলির মধ্যেও মনস্তাত্ত্বিকতার ছাপ রয়েছে। যা নামকরণের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে। 'মনের বাঘ' উপন্যাসটির প্রথম অংশে প্রথমেই মনস্তত্ত্বের কঠিন সত্যকে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন লেখক। তিনি বলেছেন—

> এই বন অন্ধকার, এই মন অন্ধকার, এই বন ভয়ংকর, এই মন ভয়ংকর, এই বনে বাঘ আছে, এই মনে বাঘ আছে....'বনের বাঘেই শুধু খায় না, জানো, মনের বাঘেও খায়। [পৃ. ৮১][১০]

এটা সত্যিই যে বনের অন্ধকার থেকে মনের অন্ধকার সবচেয়ে বেশি ভয়ংকর। মনের সেই অন্ধকারের মধ্যে মানুষের অন্য এক সত্তা লুকিয়ে থাকে যা প্রকৃত মানুষকে মাঝে মাঝে চালনা করে। যাকে লেখক তুলনা করেছেন 'বনের বাঘের' সাথে। তাই তিনি বলেছেন—'বনের বাঘেই শুধু খায় না জানো, মনের বাঘেও খায়।" উপন্যাসটিতে আমরা নায়কের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। এছাড়া 'এই দাহ' উপন্যাসে গোলক, 'লোকটা' উপন্যাসে লোকটা, 'গড়িয়াহাট ব্রিজের উপর থেকে, দুজনে', 'এক ধরনের বিপন্নতা' এবং 'কমলা কেমন আছে' উপন্যাসগুলিতে স্বাধীনতা-উত্তর মানুষের যে মানসিক অবস্থার স্থিতি পরিবর্তিত হয়েছে কেন? সেটাই আমরা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে। অন্যদিকে গল্পসমগ্রের গল্পগুলিতে স্বাধীনতা-সমসাময়িক, স্বাধীনতা-উত্তর নানা ধরনের কাহিনি বিবৃত হয়েছে। এই সমস্ত কাহিনির মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলির সমকালীন মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ করব। এছাড়া রয়েছে লেখকের কতকগুলি অগ্রন্থিত গল্প। সেই গল্পগুলির ক্ষেত্রেও আমরা চরিত্রগুলির একই মানসিক অবস্থান

দেখতে পাই। অর্থাৎ এসমস্ত ক্ষেত্রে চরিত্রে মনস্তাত্ত্বিকতা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমরা লেখকের মনস্তাত্ত্বিকতাকে বিচার করার চেষ্টা করব।

লেখক নিজেই বলেছেন 'মন অন্ধকার', 'এই মন ভয়ংকর' 'এই মনে বাঘ আছে'। আর মানুষের যে কোনো সম্পর্কের ভাঙন সম্পর্কে টানাপোড়েনের ক্ষেত্রে 'এই ভয়ংকর মন' বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। আমরা লেখকের দেখানো পথেই তাঁর উপন্যাস ও গল্পের বিভিন্ন সম্পর্কের ভাঙাগড়া, টানাপোড়েন নানান জটিলতাকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। প্রথমেই আমরা দেখব ত্রিলজি উপন্যাস তিনটিকে। 'জল পড়ে পাতা নড়ে' উপন্যাসটির সময়টা ঠিক ভারতবর্ষের প্রাক-স্বাধীনতাপর্ব, ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কিছু সুবিধালোভী মানুষ শহর ও গ্রামে নিজেদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে বিভেদ সৃষ্টি করতে লাগল। এবং একটা সময় যারা গ্রামেরই মানুষ ছিল, কিছুকাল কার্যসূত্রে কলকাতায় থাকতে বাধ্য হয়। আবার তারা যখন নিজের গ্রামে ফিরে আসে,তাদেরকে সেই সমস্ত স্বার্থান্বেষী মানুষেরা নিজ গ্রামে পরবাসী করে তুলেছিল। সেই রকমই একটি চরিত্র 'মেজকর্তা'। তার সম্পর্কে গ্রামের বুদো ভুঁয়ে বলেন—'এ গ্রামে তিনি অতিথি'। 'এ গ্রামের কেউ নন তিনি'। মেজকর্তা ধীরে ধীরে বুদো ভুঁয়ের কথাই বিশ্বাস করতে থাকে। তাই মেজকর্তার মনে হয়—

> সত্যিই তাঁর এখানে কোনও শিকড় নেই। নেই বলেই এখানকার ঘটনাপ্রবাহে ভাসমান ভেলায় তাঁর ভূমিকা অসহায় এক যাত্রীর ভাল মন্দ যা-ই কিছু ঘটুক না কেন, কোনও কিছুই মোড় ফেরাবার সাধ্য তাঁর নেই। বুদো ভুঁয়ের এই মাটিতে শিকড় আছে, শক্ত শিকড়। যতই মারাত্মক হোক, একটা ঘটনার সৃষ্টি সে করতে পারে। মেদ্দা সাহেবও পারেন। কারণ ওরা সব নুনের পুতুল। নিজের নিজের সমাজের সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে ওরা সহজেই গলে যেতে পারে। [জল পড়ে পাতা নড়ে, পৃ. ৭১][১১]

তাই মেজকর্তার নিজেকেই নিজের মনে হয়েছে, 'সিন্ধবাদ নাবিকের গল্পের সেই মায়াবী বৃদ্ধের মতো', যার কাঁধে চেপে আছে ব্যক্তিত্বের বোঝা। তাই সে বলে—

> মানুষ যে মানুষ থাকতে চায় না। ভালবাসে নুনের পুতুল হতে সমুদ্রের নোনা জলে মিলিয়ে যেতেই তার আগ্রহ প্রবল। তাতে প্রবল গর্জন সহজেই তোলা যায়। ঢেউয়ের গুঁতোয় অস্থির করে দেওয়া যায়। একটা নিরাবয়ব সমষ্টি সম্পর্কে নিদারুণ সম্ভ্রমবোধ জাগিয়ে তোলা যায় সকলের মনে।
>
> তাই তো গোপাল আর গোপাল থাকল না। সে হিন্দু সমাজের বিস্তীর্ণ সমুদ্রের জলে নুনের পুতুলের মতোই গলে গেল। ছোলেমানও মিলিয়ে গেল মুসলমান সমাজের মধ্যে। বিতর্কে বিশ্বাসের ভিত নাড়ানো যেমন যায় না, তেমনি নুনের পুতুলকে যুক্তি দিয়ে বোঝানোও যায় না। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৭১][১২]

মেজকর্তার যে মনস্তাত্ত্বিকতাকে দেখানো হয়েছে তাতে তাঁর সমাজ সম্পর্কে এবং নিজের সম্পর্কে একধরনের সরলরৈখিক মত প্রকাশিত হয়েছে। এই মেজকর্তার পাশাপাশি যদি ছোটকর্তাকে দেখি, দৃষ্টিগাহ্য সচেতন স্তরের মধ্য দিয়ে যদি দেখি তাহলে তাকে লম্পট চরিত্র বলে মনে হয়। কারণ তার ঘরে বৌ থাকা সত্ত্বেও গোপালদাসীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। যার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন—

> গোপালদাসী পাটরানির রূপ ধরে ছোটকর্তার মনের সিংহাসনে বিরাজ করতে থাকত। মায়া মমতায় প্রেমে ছোটকর্তা কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়তেন। যেন পঙ্গু হয়ে পড়তেন। অসাড় শিকারকে নিয়ে শিকারি বিড়াল যেমন খেলা করে, গোপালদাসী তেমনি ছোটকর্তার শিথিল ব্যক্তিত্ব নিয়ে ইচ্ছেমতো খেলা করত। [পৃ. ৪৫][১৩]

এখানে সেই ফ্রয়েডের প্রসঙ্গ সূত্র টেনেই বিশ্লেষণ করতে হয়, যে, ছোটকর্তার মনের অচেতন অংশে লুকিয়ে থাকা কামের ক্ষুধা গোপালদাসীর সংস্পর্শে এসে সচেতন ভাবেই স্ফুরিত হয়েছে। তবে ছোটকর্তা ছোট বউ বা ছোটকর্তা গোপালদাসী সম্পর্কের মধ্যে কোনো সংঘর্ষ সেই অর্থে লক্ষ করা যায়নি। কারণ ছোটবউ সমাজ পরিবারের কাছে সে তার দায়বদ্ধতা পালনে ব্যর্থ হয়েছে। তাই সে ধীরে ধীরে ধীরে তার স্বাভাবিক স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছে। আর সেই সুযোগে গোপালদাসী ছোটকর্তাকে নিয়ে মিথ্যে সম্পর্কের জাল বুনেছে। আর সেই জালে ছোটকর্তা নিজেকে ধীরে ধীরে জড়িয়ে ফেলেছে। তাই তাকে বলতে শোনা যায়—

এ সুখের কাছে ঘর-সংসার, প্রভাব প্রতিপত্তির মুখ বিলিতি মদের পাশে যেন বেলের পানা বলেই মনে হয়। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৭০][১৪]

আবার উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র গিরিবালা ও ভূষণ এদের সম্পর্কের মধ্যে কোথাও কোনো জটিলতা তৈরি হতে দেখা যায়নি সরল একরৈখিকভাবেই তাদের কাহিনি এগিয়ে গেছে সমস্ত উপন্যাস জুড়ে। সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে 'প্রেম নেই' উপন্যাসে কিছু চরিত্রে এবং কোনো কোনো সম্পর্কের মধ্যে সংঘর্ষ ও টানাপোড়েন লক্ষ করা গেছে। আমরা এবার সেটাই বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। 'প্রেম নেই' উপন্যাসের প্রধান দুই চরিত্র ছবি ও ফটিক এদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্কের কোনো ভুলবোঝাবুঝি না থাকলেও তাদের মাঝে সইফুন নামে একটি চরিত্রের হঠাৎ আগমন হয়। কিন্তু দ্বন্দ্ব-জটিলতা যা কিছু দেখানো বিষয় তা লেখক সমস্তটাই সইফুন চরিত্রের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন। ছবি ও ফটিকের সম্পর্কে সাবলীলতাকে বজায় রেখে।

ফটিক ও ছবি ——→ ফটিক-সইফুন-ছবি

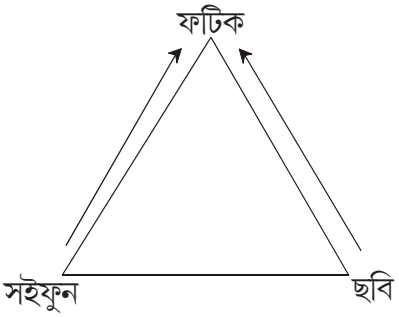

সইফুন চরিত্রটিতে ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণের ভাবনার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। বিবাহিত পুরুষ ফটিক, ছবি তার বিবাহিত স্ত্রী। সমস্ত কিছু জেনেও সইফুন ফটিকের প্রতি টান অনুভব করতে লাগল। ফটিকের জীবনে ছবির যে জায়গা সেই জায়গাটি দখল করার ইচ্ছে তার মনের মধ্যে জেগে উঠতে লাগল। তাই ফটিক যখন ছবির খুব অসুখ শুনে ভোরে জরুরি ডাকে ঝিনেদায় চলে যায় তখন সইফুন নিজের মনেই বলতে থাকে—'ছবি-বু মরুক। ছবি-বু মরুক।' [পৃ. ২০০][১৫] এক্ষেত্রে ফ্রয়েডের স্বকামের কথা বেশি করে প্রযোজ্য বলে মনে হয়। প্রথমে ফ্রয়েডের 'স্বকাম' বিষয়টি একটু পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। ফ্রয়েড মনে করতেন পুরুষদের তুলনায় মেয়েরা অনেক বেশি স্বকাম দ্বারা চালিত। অর্থাৎ ভালোবাসা পাবার আকাঙ্ক্ষা তাদের মধ্যে ভালোবাসা দেবার আকাঙ্ক্ষার তুলনায় অনেক প্রবল। যা এক্ষেত্রে আমরা সইফুন চরিত্রের মধ্যে দেখতে পাই। ফ্রয়েড মনে করেছিলেন যে, হিংসে এবং ঈর্ষা মেয়েদের ভালোবাসা বা যৌন জীবনে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সেক্ষেত্রে নীতি আর ন্যায় বিচার একটু পেছনের সারিতেই থেকে যায়। আর সেটা স্পষ্টভাবে লক্ষ করা গেল সইফুনের চরিত্রের মধ্যে। শফিকুল (ফটিক) যখন তাকে অসচেতন অবস্থায় সইফুনকে ছবি ভেবে কাছে টেনে নিল, তখন সইফুন কিন্তু নিজেকে শফিকুলের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেনি। বরং কিছু মুহূর্তের জন্য সুখকর রমণীয় উষ্ণতাকে অনুভব করেছে।

শফিকুল ওকে বুকে টেনে নিল। চায়ের বাটি ছিটকে পড়ে গেল। সইফুন অন্ধকারের আবছা উড়নি গায়ে দিয়ে ফটিকের বুকে চোখ বুজে এলিয়ে পড়ল। ফটিক কেবলই সইফুনের ঠোঁটে গালে নিজের ঠোঁট গাল ঘষতে লাগল।

আর বিড়বিড় করে বলতে লাগল ছবি ছবি ছবি।

সইফুন ফটিকের বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে চুপ করে পড়ে থাকল কিছুক্ষণ। তার শরীরে আশ্চর্য সুখকর রমণীয় উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত। বুকের রক্ত দ্রুত চলছে। তার কুড়ি বছরের জীবনে এ অভিজ্ঞতা একেবারে নতুন এবং অভাবনীয়। ক্ষণকালের জন্য ভুলে গিয়েছিল সে কে? সে কোথায়?" [সমগ্রন্থ, পৃ. ১৮৮][১৬]

ক্ষণকালের আবেশ সইফুন কিছুদিন ভুলতে পারে না। তাই নানা রকম কাজের অছিলায় শফিকুলের (ফটিক) ঘরে গিয়ে, গত সন্ধ্যার ঘটনার আবেশ অনুভব করতে দেখা যায় সইফুনকে।

ফাঁকা বাসায় ফটিকের বিছানা ঝাড়তে ঝাড়তেই হঠাৎ ওর মনে সেই ছবিটা ভেসে উঠল। একটা ছায়া আরেকটি ছায়াকে হাত বাড়িয়ে টেনে নিল। সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরটা একটা ভূমিকম্পে যেন টালমাটাল হয়ে গেল।

সে ফটিকের বিছানায় উপুর হয়ে শুয়ে নিজেকে সামলে নিতে চাইল। হঠাৎ সে শুনল বাইরের দরজা খুলে ফটিক ভিতরে ঢুকল। সইফুন তক্ষুনি উঠে পালাতে চাইল। সইফুন শুয়ে রইল। ....সইফুন শুয়ে রইল। তার মনে উথাল তুফান। বাইরের ঘরে ফটিক ঢুকল। সইফুন শুয়ে রইল। কী অস্থির, কী অস্থির।

.....সইফুনের হঠাৎ মনে হল সেই ছায়াটা একেবারে কাছে এসেছে। কী অস্থির কী অস্থির। এবার তাকেও টেনে নেয়....সে দাঁতে দাঁত চেপে শুয়ে রইল। ফটিক ভাই-এর কোনও সাড়া নেই। সইফুন ক্লান্ত হল। সইফুন হতাশ হল। সইফুন উঠে পড়ল। আর আসব না, আর আসব না, আর আসব না। সইফুন অভিমানের তীক্ষ্ণ ছুরি চালিয়ে তার দেহটাকে ফালা ফালা করে চিরল তারপর দ্রুতপদে বাড়িতে চলে গেল।

যাবো না, যাবো না, আর যাবো না। বালিশে মুখ গুঁজে গুঁজে কাঁদতে কাঁদতে কসম খেলো সইফুন। তয় আবার যাই ক্যান্? না যায়ে পারিনে ক্যান? আল্লা গো! [সমগ্রন্থ, পৃ. ১৯৩][১৭]

এক্ষেত্রে সইফুনের যে মানসিক অবস্থান্তর দেখতে পাই, সেক্ষেত্রে ফ্রয়েডের মনের বিভিন্ন স্তরের কথা আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয়। মানবমনের বিভিন্ন স্তরের কথা ফ্রয়েড বলেছিলেন, তার একটি রেখাচিত্র অধ্যায়ের সূচনাতেই আমরা দিয়েছি। তাতে মানবমনের কতকগুলি স্তরকে দেখানো হয়েছে। মানবমনের এই স্তরগুলির মধ্য দিয়ে মানুষের নানা ক্রিয়া-প্রক্রিয়াগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়। মানবমনের তিনটি স্তরের মধ্যে অচেতন বা Unconsciousঅতলে লুকিয়ে থাকে বিভিন্ন প্রবৃত্তি। যেমন কামনা (Libido), ক্রোধ. (Anger), ভয় (Fear), ঘৃণা (Hatred)। এই প্রবৃত্তিগুলি নানান জটিল প্রক্রিয়ায় উঠে আসে উপরিতলে অর্থাৎ অবচেতন (Preconscious) স্তরে। এরপর প্রবৃত্তিগুলো দৃষ্টগ্রাহ্য সচেতনতার স্তরে পৌঁছেতে চায়। কিন্তু সেখানে গিয়েই বাধা পায় শাস্তা (Super ego অর্থাৎ সামাজিক অনুশাসন) অন্যদিকে অহম (Ego অর্থাৎ সক্রিয় সত্তা যা সেই সামাজিক অনুশাসনকে মানতে বাধ্য করে) এইরকম পরিস্থিতিতে প্রবৃত্তিগুলো পরিবর্তিত হয়ে যায় অবদমিত অচেতন কামনা বাসনায়। অর্থাৎ ফ্রয়েড যে স্তরটির নাম দিয়েছেন অবদমিত সচেতন কামনা বাসনা (Repressed Conscious Desires)। আর সেই কামনা-বাসনার প্রকাশ ঘটে স্বপ্নের মাধ্যমে। তাতেই লুকিয়ে থাকে অবদমিত আকাঙ্ক্ষার আসল চেহারাটি। যা আমরা দেখতে পাই 'প্রেম নেই' উপন্যাসের 'সইফুন' চরিত্রটির মধ্য দিয়ে। সইফুনের মনের অচেতন বা অতলে লুকিয়ে থাকা কামনা, ভয় ও ঘৃণা এই প্রবৃত্তিগুলো দৃষ্টিগ্রাহ্য সচেতনতার স্তরে পৌঁছতে চেয়েছে। কিন্তু সেখানে গিয়ে সে বাধা পেয়েছে সামাজিক অনুশাসনের দ্বারা, যা সে মানতে বাধ্য। এইরকম পরিস্থিতিতে তার অবদমিত কামনা-বাসনা প্রকাশ ঘটেছে স্বপ্নের মাধ্যমে। যা বারে বারে তাকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছে। লেখক গৌরকিশোর ঘোষ সইফুনের কঠিন মনস্তত্ত্বের একটি সুন্দর বিশ্লেষণ করছেন—

ভাল কি মন্দ, কী করেছে তা সে জানে না, তবে তার মনে মাঝে মাঝে ফটিক ভাই এর বুকে পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়। যে প্রবল তৃষ্ণায় অহরহ বুক ফেটে কাঠ হয়ে থাকে। ফটিক ভাই এর বুকে মুখ গুঁজে তার উপশম পেতে ইচ্ছে হয় তার। ফটিক ভাই! ফটিক ভাই! তুমি কী পাষাণ!

না, তার কথা আর ভাববে না সইফুন। ভাববে না! সে কি ইচ্ছে করে ভাবে? রাতে ঘুমুতে পারে না সইফুন। একটা তপ্ত শ্বাস, একটা স্পর্শ তার গায়ে ঠেকা মাত্র সে চমকে ওঠে। ঘুম ভেঙে যায় তার। জ্বালা, জ্বালা-জ্বালা তার দেহটা পুড়ে পুড়ে খাক হতে থাকে। সে পাগলের মত দৌড়ে চলে যেতে চায়। ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় ফটিকের বুকে। সে জানে শুধু ওখানেই সে তার জ্বালা জুড়োতে পারে। কিন্তু নিজেকে আটকে রাখে সইফুন। গভীর রাতে সে উঠোনে গিয়ে দাঁড়ায়। বেশীর ভাগ দিনই ফটিকের ঘর অন্ধকার। জানালা বন্ধ থাকে। কখনও জানালা খোলা অন্ধকার। কখনও ঘরে আলো জানালা খোলা। সেদিন আর ঘরে ফিরতে পা ওঠে না তার। ক্বচিৎ সে দেখে জানালা খোলা ঘরে আলো আর একটা লোক। লোকটার ছায়া বলাই ভালো, ভূতের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে অস্থির হয়ে। এইসব দিনে ভয় পেয়ে যায় সইফুন। থরথর শরীর নিয়ে দ্রুত ঘরে এসে ঢোকে। শক্ত করে খিল এঁটে দেয়। এ রোগ, সে জানে সারবার কোনও লক্ষণ নেই। বরং বাড়ছে দিনে দিনে। [পৃ. ১৭৪][১৮]

তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দলীয় নেতা ও দলের মধ্যে ভাঙা-গড়া যেমন ভাবে লক্ষ করা যায় ঠিক একই রকমভাবে 'প্রেম নেই' উপন্যাসের দাউদ মিঞা চরিত্রটি ভাঙাগড়ার খেলায় মেতে ওঠে। দাউদ মিঞার চারিত্রিক টানাপোড়েনকে বিশ্লেষণ করব মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি দ্বারা। উপন্যাসের প্রথমে দেখা যায় 'দাউদ মিঞা'র সাথে 'ফুটকির' সম্পর্ক এরপর সে 'জিরেবিবি' 'দুলে বিবি' এবং শেষ পর্যন্ত 'সইফুনের সঙ্গে ধীরে ধীরে সম্পর্কে জড়িত হয়ে পড়ে।

(১) দাউদ-ফুটকি-জিরেবিবি (কালোজিরে)-বাইতিদা

সম্পর্কের টানাপোড়েনে ফুটকির মৃত্যু

উপন্যাসের প্রথমদিকে দেখা যায় ফুটকি দাউদের বিবাহিত স্ত্রী। তাদের বিবাহিত জীবন ছবি-ফটিক এর জীবনের মতো স্বাভাবিক গতিতে না চললেও, ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এরই মধ্যে তাদের সম্পর্কের মাঝে বাধ সাধল জিরেবিবি (কালোজিরে)। অন্যদিকে কালোজিরেকে বাইতিদা ওদের গ্রাম থেকে পালিয়ে নিয়ে এসেছে। কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো রকম সামাজিক সম্পর্ক নেই। বাইতিদা-জিরে বিবিকে বিয়ে করে ঘরে আনেনি। তাই দাউদের বিয়ে করতে এমনকি তাদের দুজনের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তুলতে কোনো অসুবিধে নেই। মনে মনে একথা স্বীকার করেছে দাউদ ফুটকির কাছে। সে বলেছে—

> আমি হয়ত তুমার সঙ্গে বেইমনি করিছি। কিন্তু আর কোনও অন্যায় করিনি। কালোজিরে বাইতিদার বউ নয় ফুটকি। ওরে শাদী করে ঘরে আনেনি বাইতিদা। খোদা কসম! যাত্তারা গাতি ওগের গিরামে যায়ে এর সঙ্গে ভাব হয়। ওরে নিয়ে চলে আয়েছে। তাছাড়া আমি কালোজিরেরে ভাগায়া আনিনি ফুটকি। ও নিজি সেই চলে আয়েছে। নিজের ইচ্ছেয় আমার বিবি হতি চায়েছে। আমি ওরে নিকে করব। [পৃ. ১৪৬][১৯]

এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে—কালোজিরের মনের অচেতন স্তরে লুকিয়ে থাকা লোভ-লালসা ও কামের ক্ষুধা অচেতন স্তর হয়ে সচেতন স্তরে বেড়িয়ে আসতে চাইছে। আবার অন্যদিকে দাউদের মধ্যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের মিথ্যে অহংকার বোধ কাজ করেছে। তার বার বার এটাই মনে হয়েছে 'মুসলমানের ঘরে দুই বিবি পুষা, কিছুই অন্যায় নয়।'

অন্যদিকে 'ফুটকি' গ্রামের লোকজনদের মুখে দাউদ সম্পর্কে নানা ধরনের কথা শুনে, তার মনে বারে বারে বিভিন্ন প্রশ্ন জেগে উঠেছে—

> তার সঙ্গে এমন বেইমানি করল কেন দাউদ? সে কি ওর সঙ্গে মোকামে যেতে চেয়েছে বলে? কিন্তু এ প্রস্তাব দাউদই তো তাকে দিয়েছিল। তবে? আরেকটা শাদি করবে বলে? তাই যদি দাউদের ইচ্ছে ছিল তবে সেকথা বলল না কেন তাকে? সেকি বাধা দিত? না বাধা দিতে পারত? মুসলমানের মেয়ে হয়ে তার খসমের আরেকটা শাদিতে বাধা দেবে, এমন বুকের পাটা তার আছে? সে ক্ষমতা তো কোনও মেয়ের নেই। তবে তার সঙ্গে এমন প্রবঞ্চনা কেন করল দাউদ? এত সোহাগ, এত এত আদর, তাকে অনাদরের জন্য দিনে পর দিন এত অনুশোচনা, এ সবই ফাঁকি? ঠকানো? তাহলে ওগুলোকে সত্য বলে মনে হয়েছিল কেন? কিছুই বুঝতে পারে না ফুটকি। [পৃ. ১৪১][২০]

ফুটকি নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করতে করতে শেষ পর্যন্ত আত্মহননের পথ বেছে নেয়। উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই যে, ফুটকি যখন নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে ধীরে ধীরে প্রস্তুত হচ্ছে, তখন বিপরীতে দিকে দেখতে পাওয়া যায় নিশুতি রাতে নিস্তব্ধ হোটেলের ঘরে দাউদের শরীরের উপর নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোচ্ছে কালোজিরে। এই দুটো ঘটনার বিবরণ লেখক দিচ্ছেন একই সাথে খুব নিপুণভাবে।

ফুটকির আত্মহনন—

> ফুটকি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। নিঃশব্দে দরজা খুলল। নিরুত্তেজকভাবে ঘরের কোণে রাখা ভরনের ভারি ঘড়াটাকে কাঁখে তুলে নিল। তারপর রোজ যেমন যায় তেনি খিড়কি পুকুরে চলে গেল। তবে আজ আর হাজীদের বাঁধা ঘাটে না। ওদের ঘাটে গিয়ে দাঁত মাজতে বসল। ধীরে সুস্থে মুখ ধুলো। পরণের শাড়িটা আঁট করে পড়ল। আঁচলটা যতদূর পারে লম্বা করে নিল। মাঝখানটা দিয়ে নিজের গলায় একটা ফাঁস এমনভাবে বাঁধল যাতে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট না হয়। আঁচলের মুখটা দিয়ে ঘড়ার গলাটা বেশ শক্ত করে বেঁধে নিল। টেনে টেনে দেখল, খুলবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই।
>
> .....ফুটকি নিঃশব্দে জলে নেমে গেল। আঃ ভোরের ঠান্ডা জল তার শরীরের সব তাপ, সব সন্তাপ, সব জ্বালা যেন জুড়িয়ে গেল। খুব আরাম বোধ করল ফুটকি। আঃ কী শান্তি।সে ঘড়াবুকে করে নিঃসাড়ে সাঁতার কেটে একেবারে মাঝ পুকুরে চলে গেল।
>
> ....ফুটকি একবার শুকতারাটা রেখে নিল। তারপর ঘড়াটা উল্টে ভরতে লাগল। একটুক্ষণ বগবগ করল তারপর ঘড়াটাই ওকে টেনে নিল অতলে। [পৃ. ১৪৬][২১]

অপরদিকে কালোজিরের কামনা-তাড়ি, ভাবাবেগের দৃশ্য—

> ''নিশুতি রাতে সেই নিস্তব্ধ হোটেলে দাউদ চিত হয়ে শুয়ে আছে। ওর শরীরের উপর উপুর হয়ে পরম নিশ্চিন্তমনে সেই তখন থেকে ঘুমুচ্ছে কালোজিরে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেবার সময় কখনওবা কালোজিরের পেটটা ঠেকছে ওর পেটে আবার কখনও বা বুক ঠেকছে ওর বুকে।' [পৃ. ১৪৬][২২]

এই দুটি ঘটনা পরম্পরা ও চরিত্রের মধ্যে দিয়ে লেখক পরিষ্কার করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। একটি চরিত্রের মধ্যে তিনি সহজাত প্রবৃত্তির ঘৃণা (Hatred)-কে তীব্রভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। অন্যটিতে সহজাত প্রবৃত্তির কামনার (Libido) উদ্বেলতাকে দেখানোর চেষ্টা করেচেন। এই কামনার উদ্বেলতার চিত্র কালোজিরে চরিত্রের মধ্যে দিয়ে লেখক নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

> কালোজিরের ডাক শুনে কুরিদের ঘাটে পথের উপর দাউদ যেন পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। খোদাকসম, সে এমন ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তার সারা মন জুড়ে তখন ফুটকি। কাপড় পেলে ফুটকির মুখ চোখের ভাব কেমন হয়, সে তারই একটা আন্দাজ পাবার চেষ্টা করছিল মনে মনে। সেই চিন্তাতেই বিভোর হয়ে পথ চলছিল দাউদ। তাই সে সাবধান বা সতর্ক হবার কোনও অবকাশই পেল না। একেবারে কালোজিরের মুখে পড়ে গেল। তারপর কালোজিরে যখন ভিজে ঘোমটার ফাঁক দিয়ে চাইল এবং মিচকি মিচকি হাসল, তখনই সে লবেজান। সে মনে মনে ত্রাহি ডাক ডাকতে লাগল মুখ শুকিয়ে উঠল, বুকের মধ্যে ধুকপুকানি বেড়ে গেল। ঠিক প্রথম দিন কালোজিরের মুখোমুখি হয়ে তার অবিকল এই অবস্থা হয়েছিল। সেদিন তবু সে পালাতে পেরেছিল। কিন্তু আজ? কালোজিরে আবার ঘোমটার ফাঁকে হাসল। দাউদ অবশ। সওদাগর! কেমন আস্তে ডাকে কালোজিরে। একটু ফিসফিসে আওয়াজ কিন্তু কী তার জোর! কলজেটা উপড়ে আসতে চায়। সে থ মেরে দাঁড়িয়ে আছে পথে আর তাকে 'বাড়ি আসো' বলে এক ডাক দিয়ে কালোজিরের মাতাল করা দুলকি দেহ, ভিজে কাপড় শরীরের সঙ্গে একেবারে লেপ্টে আছে, ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে পথে জল ফেলে ফেলে, এই ছবিটা, এখন যখন কালোজিরে তার বুকে পড়ে আছে নিশ্চল, নিস্পন্দ এবং তৃপ্ত, খুলনার দি নিউ মোসলেম হোটেলের, যেখানে পর্দানশীন মহিলাদিগের থাকিবারও বিশেষ বন্দোবস্ত আছে, এই অন্ধকার ঘরে, ঠিক তখনই

তার চোখে পরিষ্কার ভেসে উঠল। দাউদ পালাতে চাইছিল, পারল না। ফুটকির জন্য কেনা শাড়ি দুটো হাতের মুঠোয় চেপে ধরে সে নিজেকে রক্ষা করতে চাইছিল, পারল না। সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে চেষ্টা করল, পারল না। হঠাৎ সে আবিষ্কার করল, সে কালোজিরের ভিজে শরীরের এঁকে যাওয়া চিহ্ন ধরে চলতে শুরু করেছে। প্রথমে ধীরে, পরে ক্রমশ জোরে। [পৃ. ১৪৩][২৩]

এতক্ষণ ধরে দেখানো হল 'দাউদ'কে কেন্দ্র করে দুই নারীর মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন। কালোজিরেকে নিয়ে দাউদ গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসে। সেখানে কালোজিরের সাথে কিছুদিন কাটানোর পর, কালোজিরেই তাকে সর্বস্বান্ত করে আরেকজনের সঙ্গে চলে যায়। নারায়ণগঞ্জের এক হিন্দু গুন্ডার সাথে সে কলকাতায় চলে আসে। এরপর দাউদ যশোর জেলার খোনকার সাহেবের কৃপায় ঠিকেদারী ব্যবসায় আশ্চর্য দক্ষতা দেখাতে লাগল। প্রথমদিকে দাউদের মনে একটা শূন্যতাবোধ ছড়িয়ে পড়েছিল। একা অবয়বহীন অস্বস্তি তাকে পীড়িত করে তুলেছিল। প্রথম প্রথম কালোজিরের চিন্তা তাকে খুব পীড়িত করত। সে অস্থির হয়ে উঠত। তখন তার মনের মধ্যে সংসার, পরিবার-পরিজন, ফুটকি কালো জিরের কথা দ্বন্দ্ব সংঘাতে বিদীর্ণ করে তুলত। সমাজ সংসারে যে মান ইজ্জত সে হারিয়ে ফেলেছে—তাকে ফিরিয়ে আনতে চায়। তখন সে মনে মনে বলেছে—

''ফুটকিকে সে আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না। কিন্তু তার সংসারে তার মান ইজ্জত ফিরিয়ে আনতে চায়। আজ ফুটকি নেই, মরেছে। কালোজিরে নেই, ভেগেছে। ওদের দুজনের কথা তার মনে পড়ে। ফুটকির অক্লান্ত সেবার কথা, কালোজিরের রাতকাটানোর উন্মাদনাময় অভিজ্ঞতার কথা কখনো ভুলবে কি দাউদ? কিন্তু আজ তাদের কেউ নেই। শুধু তার জেন্দেগী আছে। সে কি শুধু তার সারা জেন্দেগীভর অতীতের ভুল বা অপরাধ বা গুনাহ, যাই সে করে থাকুক তারজের বয়ে বেড়াবে? না আল্লার কাছে তার কৃতকর্মের জন্য, তা সে ভুল বা অপরাধ বা পাপ যাই হোক না কেন, মার্জনা চেয়ে নিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করবে? দাউদ শাস্ত্রের ধার ধারে না। কোরান, হাদীস, ফেকা, এসব কেতাব থেকে তার দূরত্ব অনেক। কিন্তু সে মুসলমান। সে তার সংস্কার অনুযায়ী জানে যে আল্লাহর যা অভিপ্রায় তদনুযায়ীই সে চলবে। আর সে জানে আল্লাহ ক্ষমাশীল। আর সেজানে আল্লাহ মার্জনাকারী।'' [পৃ. ২২২][২৪]

দাউদ আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে চায়। সমস্ত অতীত অপরাধ বা ভুলকে ভুলে গিয়ে সইফুনকে সঙ্গে নিয়ে। এখানেও দাউদ ও সইফুন-এর কাহিনিকে ঘিরে তৈরি হয় জটিলতা দুলি বিবিকে কেন্দ্র করে। দুলি বিবি দাউদের প্রথম যৌবনের ভুল। সইফুন তার বর্তমান। সইফুন দাউদের অতীতের সমস্ত পাপকে ক্ষমা করে, নতুনভাবে জীবন শুরু করতে সাহায্য করবে এই ছিল তার বিশ্বাস। এখন আমরা দাউদ-সইফুন ও দুলিবিবির সম্পর্কের টানাপোড়েনকে বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করব।

(২) দাউদ-দুলিবিবি-সইফুন সম্পর্কের টানাপোড়েন—

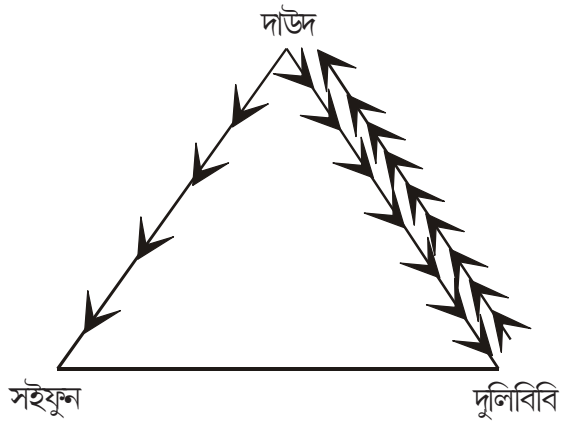

দাউদ-সইফুনের সম্পর্কটা প্রথমদিকে ছিল একমুখী। দাউদ প্রথম থেকেই সইফুনকে বিয়ে করতে চেয়েছে। তাকে নিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করতে চেয়েছে।

দাউদ-সইফুনের সম্পর্কটা প্রথমদিকে ছিল একমুখী। দাউদ প্রথম থেকেই সইফুনকে বিয়ে করতে চেয়েছে। তাকে নিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করতে চেয়েছে। কিন্তু সইফুন তখন মনে মনে চাইত শইফুলকে (ফটিক)। তখন তার মনে দাউদকে নিয়ে নানা প্রশ্ন জমা হতে থাকে। অন্যদিকে তার মনে ফটিক নিস্তরঙ্গ জীবনের প্রথম ঝড় তুলেছিল, যে ঝড় তাকে ওলোট-পালোট করে দিতে চেয়েছিল। এমতাবস্থার চিত্র লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে—

> দাউদের বিরুদ্ধে তার কী বলার আছে? প্রশ্ন উঠল সইফুলের মনে। দাউদের চেহারা ভালো। ওর ব্যবহার ভালো। অন্তত সইফুনের অভিযোগ করার কিছু নেই। দাউদ যেরকম তাড়াতাড়ি তাদের বাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল, সইফুন তা দেখে মনে মনে প্রমাদ গণেছিল। ভেবেছিল আব্বা, আম্মা বাবু আর অন্য ভাইবোনেদের যেমন হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছে দাউদ, এবার তেমন তার দিকেই হাত বাড়াবে। এতখানি বয়েস হয়েছে সইফুনের কিছু পুরুষ সম্পর্কে এতদিন ওর মনে কোনও কৌতূহল জাগেনি। ফটিক ভাই এসেই ওর নিস্তরঙ্গ জীবনে প্রথম ঝড় তুলল ভালো কি মন্দ, কী করেছে তা সে জানে না তবে তার মনে মাঝে মাঝে ফটিক ভাই এর বুকে পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছা হয়। যে প্রবল তৃষ্ণতায় অহরহ বুক ফেটে কাঠ হয়ে থাকে। ফটিকভাই এর বুকে মুখ গুঁজে তার উপশম পেতে ইচ্ছে হয় তার। ফটিক ভাই! ফটিক ভাই! তুমি কী পাষাণ।.....দাউদ তাকে চায়। কিন্তু সইফুন কী করবে? সে তো আর তার নয়। ফটিকের। ফটিকভাই ফটিকভাই তুমি কী পাষাণ! সইফুন হু হু করে কেঁদে ওঠে। [পৃ. ২৭৪][২৫]

তবে একথাও ঠিক যে, ফটিক যখন দাউদের মতলব বুঝতে পারল তখন তার মনের মধ্যে একটা তীব্র অনুশোচনার জ্বালা জ্বলতে লাগল। এবং হঠাৎ করে সেই উষ্ণ সন্ধ্যাটা তার মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে যায়। মনে মনে সে ভাবতে থাকে, সইফুনের সর্বনাশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পারবে না। দাউদ ও সইফুনের সম্পর্কের বিষয়টি নিয়ে ফটিকের মনে এক দ্বন্দ্বের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে তার বিবরণ দিয়েছেন লেখক—

> ''না, সেই সইফুনের সর্বনাশ হতে দেবে না। সে বরং তাকেই কথাটা বলবে। হ্যাঁ, সেই ভালো। সইফুন তার কথা অবিশ্বাস করবে না। নিশ্চয়ই না। কিন্তু কোথায় সইফুন। আজ তিন মাসের উপর তার সঙ্গে দেখাই হয়নি। শফিকুলই তো এড়িয়ে গিয়েছে তাকে। হঠাৎ সেই উষ্ণ সন্ধ্যাটা মূর্ত হয়ে উঠল। এক লহমার জন্য সইফুন এসে তার আলিঙ্গনে ধরা দিল। তারপরই স্মৃতিটা মিলিয়ে গেল।
>
> সে তবে এই! সে তবে এই! তীব্র অনুশোচনায় জ্বলতে জ্বলতে শফিকুল ক্লান্ত হয়ে চেয়ারে বসে পড়ল। সইফুনকে কে অধিকার করবে? সে না দাউদ? এখন এইখানে সে এনে ফেলেছে নিজেকে! তাই তার দাউদের উপর এত রাগ। তাই দাউদকে সে সরাতে চায়? না না। দাউদ খারাপ, দাউদ খারাপ। আমি সইফুনের ভাল চাই, ভাল চাই। সইফুন সইফুন! একটা অপ্রতিরোধ্য তৃষ্ণা জাগ্রত হয়ে শফিকুলকে কাতর করে তুলতে লাগল।'' [পৃ. ২৭০][২৬]

দাউদ সইফুনকে পেতে চায়। কিন্তু দাউদ দেখলে সইফুনের মনে আশঙ্কার এক কালো মেঘ ঘনিয়ে ওঠে। সইফুনের মনের এই রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখে দাউদ মনে মনে ভাবে—

''সইফুনরি না পালি আমার কী ক্ষেতি? মেয়ের কি অভাব আছে দেশে? ভাত ছড়ালি কাগের অভাব? এদেশের মুসলমানগের বিয়ের বাজারে অন্তত না।'' [পৃ. ২৭৪][২৭]

শেষপর্যন্ত সইফুন দাউদকে বিয়ে করতে রাজি হয়। এরপর থেকে দাউদের মনের অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

''দাউদ তার মনের দিকে চেয়ে দেখল, সইফুন সম্পর্কে সেখানে এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের অনুভূতি বিরাজ করছে। এমনটি আর কোনও মেয়ের বেলায় সে অনুভব করেনি। সইফুনের কথা মনে হলে সে শরীরের ডাকে উন্মত্ত হয়ে ওঠে না, যদিও তাকে বিছানায় পেতে তার খুবই ইচ্ছে হয়। কিন্তু তার চাইতেও বেশি ইচ্ছে হয় সইফুনকে নিয়ে

এখানে ওখানে যেতে। তার সঙ্গে বসে বসে বা পাশাপাশি শুয়ে কথা বলতে। সইফুনের ফরমায়েশ খাটতে। তাকে সকল বিপদ আপদ থেকে বুক দিয়ে আড়াল করে রাখতে।

আর? আরেকটা ইচ্ছেও তার হয়। বাপ হবার ইচ্ছে তার হয়। খুব হয়। দাউদ আয়নাটায় তার মুখখানা দেখে নিল। যেন যাচাই করল, বাপ হলে তাকে মানাবে কিনা? সইফুন হবে দাউদের বাচ্চার মা কথাটা ভাবতে থাকলেই দাউদের শরীর সুখে শিরশির করতে থাকে। [পৃ. ২৮১-২৮২][২৮]

দাউদের যখন ধীরে ধীরে মানসিক অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে ঠিক সেই সময় তার জীবনের প্রথম যৌবনের ভুলের মুখোমুখি হতে দেখা যায়। দুলি বিবি চাটমোহরের দাউদের যৌবনের ভুল। তার চাটমোহরের প্রথম নেশা। একদিন যাকে না দেখলে তার জীবনটা বেরিয়ে যেত। আর সেই দাউদ আজ তাকে দেখে তার কাছ থেকে পালাতে চাইছে। দাউদ তাকে এবং নিজের মনে নিজেকে প্রশ্ন করতে লাগল

তুমি? তুমি এখেনে ক্যান?

দাউদ কেমন নিস্তেজ গলায় প্রশ্নটা করল। আর দুদিন বাদে আমার শাদি। তুমি এখেনে ক্যান? দুলি বিবি? তার চাটমোহরের ইয়ার মোকছেদ ভাইর বিবি। দাউদের মনে পড়ল। দাউদ বলত রসের ভাবী। কিন্তু সে তো অতীতের কথা। দুলি বিবি এখন এখানে কেন? দুলি বিবি তার প্রথম যৌবনের ভুল। তার প্রথম পাপ। কিন্তু সে তো বদলে গেছে। খোনকারের বিটি সাক্ষী, সে বদলে গেছে। মতি মিঞার বিবি সাক্ষী, সে বদলে গেছে। সে তো আল্লার পথে ফিরে এসেছে। আল্লা মিঞা তো তার গুনাহ মাফ করে দেছেন। আল্লা তো তারে সইফুনরি দেছেন।"

সইফুনের কথা মনে পড়তেই দাউদের মাথায় দপ্ করে যেন আগুন জ্বলে গেল। এ ষড়যন্ত্র। সইফুনকে তার কাছ থেকে কেড়ে নেবার ষড়যন্ত্র। [পৃ. ৩৩৪][২৯]

দুলি বিবি শুধু একা ছিল না, তার সাথে ছিল একটি ছোট বাচ্চা। সে বাচ্চাটার বাবা হিসেবে দাউদের পিতৃত্বকেই দাবি করেছে। কিন্তু দাউদ তার পিতৃত্বকে অস্বীকার করেছে। দুলি বিবি দাউদকে উদ্দেশ্য করে বলেছে—

> আমি শয়তান আর তুমি ফেরেশ্তা জিব্রাইল? না তুমি আমার সর্বোনাশ করে চাটমোহর থেকে পালায়ে গেলে। আমার প্যাটে ছাওয়াল আলো। খসম আমারে তালাক দিল। তার পরের যেই লোকের বাড়ি বাঁদীগিরি কত্তিছি। তুমার বাড়িতি আমি এমনি আইছি। আল্লাই পৌঁছয়ে দেছেন। এই যে আমার কোলে, এই দ্যাখ তুমার ছাওয়াল।"[৩০]

কিন্তু দাউদ দুলিবিবির কথা বিশ্বাস করতে পারে না। সে মনে করে এটা তাকে সর্বনাশ করার জন্য দুলি বিবির একটা চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র। সে এই দুঃস্বপ্ন থেকে পালিয়ে যেতে চায়, এবং তার মনের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভূত হতে থাকে। সে কিছুতেই দুঃস্বপ্নটা মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না। সইফুন তার বর্তমান, দুলিবিবি তার অতীত। সে অতীতকে বর্তমান থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চাইছে। সেইজন্য সে দুলিবিবিকে খোরপোশ দেওয়ার কথা ভেবেছে। পর মুহূর্তেই দাউদের মনের হঠাৎ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

> "এখন আর দাউদের দুলি বিবির উপর রাগ হচ্ছে না। সত্য বলতে কি, অন্য কারো উপরেই রাগ হচ্ছে না। সে নিজেই জ্বলছে। এমনটা হতে পারে দাউদ ভাবেনি। আজ দুলি ফিরে এসেছে অতীত থেকে, কাল ফুটকি যে কবর থেকে উঠে আসবে না, তার নিশ্চয়তা কী? কাজেই দাউদের ওই মতলবে কাজ হবে না। দুলি বিবিকে কিছু টাকা দিয়ে দিলাম, সে নিয়ে চলে গেল। এত সহজে, দাউদ দেখল, অতীতের মহড়া নেওয়া যায় না। তবে কি সে পালাবে? পালিয়ে কই সে তো বাঁচতে পারেনি, যেখানেই গিয়েছে দাউদ অতীত সর্বক্ষণ তাকে অনুসরণ করেছে চিতাবাঘের মত নিঃশব্দে, তারপর সুযোগ মত অতর্কিতে লাফিয়ে পড়েছে তার ঘাড়ে। বাঁচতে তো পারেনি দাউদ? বাঁচাতে তো পারেনি তার স্বপ্নকে, সাধকে? কাজেই দুলি বিবিকে টাকা দিয়ে বিদায় করলেই তার পাপ মুছে যাবে না। পাঁচ বছর দশ বছর পরে তো আবার ঝাঁপিয়ে পড়বে আরও বিকট মূর্তিতে। দুলি যাবে, তার ছাওয়াল আসবে। আল্লাহ! [৩৩৬][৩১]

এতদিন পর্যন্ত দাউদের মগ্নচৈতন্যে অবলীন প্রকৃতিগুলি অহম (ego) ও শাস্তা (super ego) সঙ্গে মিশে সচেতন দৃষ্টি গ্রাহ্য স্তরে এসে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু শেষ মূহূর্তে এসে দেখা যাচ্ছে যে, অবদমিত সচেতন কামনা বাসনাগুলো শাস্তা ও অহমের সাথে দ্বন্দ্বে দীর্ণ হতে হতে শূন্যে পরিণত হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়—

> ''ঘুমন্ত ছেলে কোলে নিয়ে জল চৌকিতে বসে আছে দাউদ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে তাকে। এখনও দেখছে। নাঃ কোনও সন্দেহই নেই। অনেকক্ষণ বসে বসে ভাবল দাউদ। বেশ ঠাণ্ডা মাথায় ভাবল। কর্তব্যও সে ঠিক করে ফেলেছে। আজই সে কাজী ডেকে এনে নিকাহ্ করবে দুলিকে। কোনও সমস্যা থেকেই সে আর পালাবে না। তাকে বেকায়দায় ফেলতেও দেবে না কাউকে। তারপর যাবে সইফুনের কাছে। বলবে তার এক বিবি আছে, ছাওয়াল আছে, তাদের ছেড়ে সে পালিয়ে এসেছিল। আজ তারা এসে পড়েছে। সইফুন যেন তারে মাফ করে। [পৃ. ৩৩৬][৩২]

আর এখানেই দাউদের অহম (ego অর্থাৎ সক্রিয় সত্তা যা সেই সামাজিক অনুশাসনকে মানতে বাধ্য থাকে।) শাস্তার (superego অর্থৎ সামাজিক অনুশাসন) কাছে পরাজিত হয়েছে।

এবার আমরা 'প্রতিবেশী' উপন্যাসের অমিতা চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে চরিত্রটিকে দেখার চেষ্টা করব। পাশাপশি এই চরিত্রের সাথে যে সমস্ত চরিত্রের টানাপোড়েনে সংঘর্ষ হয়েছিল তা বিশ্লেষিত হয়ে প্রকাশ পাবে। আর উপন্যাসটির আরেক বিশেষ বৈশিষ্ট্যে প্রায় সকলেরই জানা। সেটা, অমিতার স্মৃতিপটের মধ্য দিয়ে সমগ্র উপন্যাসটিকে চিত্রিত করেছেন লেখক গৌরকিশোর ঘোষ। উপন্যাসটির সময়কালের বিচারে সমাজে নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভাঙা-গড়া রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে হয়েই চলেছে। আর তার ফল ভোগ করছে সাধারণ মানুষ। সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে মানুষে-মানুষে বিভেদ সৃষ্টি হয়ে চলেছে। তার ফলে অনেক সময় দুটি হৃদয় এক হওয়ার আগেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। উপন্যাসটিতে যেমন হয়েছে অমিতা ও শামিমের মধ্যে। উপন্যাসটিতে দেখা যাচ্ছে অমিতা জাতিতে হিন্দু আর শামিম জাতিগতভাবে মুসলিম। অর্থাৎ এদের দুজনের মিলনের প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে জাতিগত সম্প্রদায়। মানুষে-মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধান বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় ধর্ম। অমিতার পরিবার-সমাজ-এমনকি তার বাবার কাছে সবথেকে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল শামিম একজন মুসলিম। অমিতা-শামিমের ভালোবাসা নয়। তাই এই ভালোবাসা বন্ধনে পরিণত হওয়ার আগেই ভেঙে যায়। আর এই সম্পর্ক ভাঙার যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে শুধুমাত্র অমিতাকে। যা সারাজীবন ধরে মনের অন্ধকার গোপন কুঠুরিতে বয়ে নিয়ে চলেছে। যেমন বয়ে নিয়ে চলেছে সে তার ক্যানসার আক্রান্ত যন্ত্রণাময় শরীরটাকে। শামিম চলে যাবার পর অমিতার জীবনটা প্রচণ্ডভাবে ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল। তার জীবনের সব আলো যেন হঠাৎ করে কেউ নিবিয়ে দিয়েছিল। সেইসময় তার সমগ্র মন জুড়ে যন্ত্রণার ঢেউ আছড়ে পড়েছে। সে কোনো দিন ভাবতে পারেনি যে কোনো দিন সে যন্ত্রণার ঢেউ-এ সাঁতার দিয়ে পারে উঠতে পরবে। আজকে অমিতার শরীর জুড়ে যে ক্যানসারের যন্ত্রণা তার থেকেও ভয়ানক ছিল সেদিনের তাকে ছেড়ে শামিমের চলে যাওয়ার যন্ত্রণা। সেদিন তাকে তার দিদি বলেছিল—

> ফুলকি কোনও কিছুতেই ভেঙে পড়িস না। সেটা পরাজয়। তুই ভুলে যাস না ফুলকি, তুই মেয়ে। তুই যদি হেরে যাস, এই পুরুষের ছক কাটা সংসারে কোথাও একটা বুদবুদও ভেসে উঠবে না। পরাজয়ের গ্লানির চাইতে দুঃসহ যন্ত্রণা মেয়েদের জীবনে আর কিছুই হতে পারে না। এমনকি মৃত্যুযন্ত্রণাও নয়। [৩১][৩৩]

অমিতা (ফুলকি) ভালোবেসেছিল শামিমকে। শামিমকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে অমিতার অবদমিত মনের কামনা-বাসনাগুলো সচেতন স্তরে উঠে আসতে চায়। ফুলকির কথার মধ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়—

> বাবা তখন দিল্লিতে ছিলেন। বাড়িতে কাল সেই সময় কেউ ছিল না। কাজের লোকেরা আড়াইটের ম্যাটিনি শোয়ে সিনেমা দেখতে চলে গিয়েছিল। বাড়িতে আমি ছিলাম একেবারে একা। কয়েক পশলা বৃষ্টি ঝরার পর আকাশটা মাত্রই ধরেছে। আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। মনে পড়ে শামিম, তুমি এলে। তোমাকে দেখেই আমার সমস্ত দেহ থরথর কাঁপতে লেগেছিল। বেল বাজতেই বুঝে গিয়েছিলাম, এ তুমি এ তুমি শামিম।

তোমার কথা ভাবছিলাম বসে বসে। কলিং বেল যে এমন করে কাউকে অস্থির করে তুলতে পারে, এটা জানা ছিল না। বাঁশি কি রাধাকে এমন করেই অস্থির করে তুলত! আমি আমার ঘরে বসে বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিলাম। কিন্তু মন তো বইয়ের পাতায় ছিল না শামিম। ছিল তোমাতে। সেদিন যে কি করে দরজা খুলে দিয়েছি তা আমিই জানি। তুমি আমাকে দেখে হাসলে। সেটা লক্ষ করার মতো চোখও আমার ছিল না। আমি অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। কেবলই অস্থির। অনেক কষ্টে আমাকে সামলে রেখেছিলাম সেদিন শামিম। একটা সান্ত্বনায় নিজেকে ধরে রাখবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম। তুমি ভিতরে এলে, আমি দরজা বন্ধ করে দিলাম.....তুমি দাঁড়িয়েছিলে একেবারে আমার পিঠের কাছে। তোমার গরম শ্বাসপ্রশ্বাস আমার ঘাড়ে এসে পড়ছিল। শামিম একেবারেই আর পারছিলাম না। তুমি আমার সেই অসহ্য যন্ত্রণার শরিক হয়েছিলে কি না, এখন মনে নেই। কিন্তু তুমি আমার মনটা বুঝতে হয়ত পেরেছিলে। নইলে এত সাহস তোমার এল কোথা থেকে? বাবার ঘরে দরজার সামনে দাঁড়িয়েই তুমি আমাকে বুকে টেনে নিলে। কত সহজভাবে কত স্বাভাবিক ছিলে তুমি সেদিন। আমার মুখে তখনই এঁকে দিলে একটা সুদীর্ঘ চুম্বন। আমি গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছিলাম মাটিতে। আমার কি দম বন্ধ হয়ে আসছিল? আমি তোমার সুদৃঢ় বাহুর আলিঙ্গনের মধ্যে গলে যাচ্ছিলাম তখন? আমার কিছু মনে নেই, কিছু মনে নেই শামিম। শুধু মনে আছে, তোমার চাপে পিষ্ট হয়ে আমি বলে যাচ্ছিলাম, আমাকে নাও শামিম, আমাকে পূর্ণ করে নাও। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছিনে! [প. ১৩২][৩৪]

ফুলকি ও শামিমের সম্পর্কের মধ্যে কাম ও প্রেম পরস্পর মিলে গিয়েছিল। ফুলকি মন দিয়ে বিষয়টিকে উপলব্ধি করতে পেরেছিল। তাই সে মনে মনে বলেছে—

সুস্থ মনের চাওয়াকে দমিয়ে রাখলে অসুস্থমন জেগে ওঠে—ভাল নয়।" [পৃ. ১৩১][৩৫]

ফুলকি তার ও শামিমের ভালোবাসাকে উদ্দেশ্য করে বলেছে—

সবচেয়ে বড় ভালবাসা—আর সবই গৌণ। তবে এই ভালোবাসা গ্রহণ করার জন্য মনের শুদ্ধি দরকার। নিজেরও এগিয়ে আসা দরকার। [পৃ. ১৩১][৩৬]

ফুলকির জীবনে তখন চারপাশের ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক নানা ঘটনাকে গৌণ বলেই মনে হয়েছে। একমাত্র শামিমের ভালোবাসাকেই তার প্রধান বলে মনে হয়েছে। শামিমের অনুভূতি ফুলকিকে প্রত্যেকটি মূহূর্তে তাড়া করে বেড়াত। প্রত্যেকটি মূহূর্ত শামিমের কথা ভেবে মনের মধ্যে সে একাকিত্বের যন্ত্রণা অনুভব করত। এইরকম মানসিক অবস্থাতে ফুলকিকে বলতে শোনা যায়—

অসংখ্য মুহূর্ত কেটে গিয়েছে। না, যেমন মিলনে নয়, তেমনি বিরহেও অভ্যস্ত হতে পারিনি—খারাপ লাগছেই। মেঘে ঢাকা আকাশটা তার সমস্ত ভার নিয়ে বুকের উপর চেপে বসেছে—এ এক অসম্ভব বেদনা, একাকিত্বের অসহ্য যন্ত্রণা। অথচ এই তো শুরু—আরও কত মুহূর্তের যন্ত্রণা বাকি। মাঝে মাঝে ভাবি যে কোনও এক মন্ত্রবলে পুরনো আমির উত্তরণ ঘটেছে আজকের নতুন আমিতে। মাত্র দুটো দিনের মধ্যেই। সমস্ত জীবনের না পাওয়া বোঝা বয়ে যখন ভেবেছি পাব না কখনই, তখনই এসেছে পরিপূর্ণ পাওয়া, চাওয়ার অবসান ঘটিয়ে। আজ সারাদিন মনে পড়ছিল তোমার আমার সম্পর্কের কথা। কোনও এক অজ্ঞাত অবচেতনের প্রভাবে এই ভালবাসা একদিন রাত্রির ভালবাসায় দাঁড়াবে, দিবালোকে এটা কিছুতেই মানতে পারিনে—যদিও জানি ভালবাসার অমোঘ নিয়মে সেই দিকেই আমরা যাচ্ছি যদিও পাশাপাশি দাঁড়ালে সুতীব্র কামনার দহনে বুক জ্বলে ওঠে। জানি এও ভালবাসা তবু মনে হয় নিতান্তই প্রাথমিক স্তর। আজন্মের বিশ্বাস বা সংস্কারকে ত্যাগ করা খুবই কষ্টকর। তোমার মনেও কি এইসব সংশয় দ্বিধা দ্বন্দ্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠে? না তুমি তো সংস্কারমুক্ত, তাই জানি তোমার মনে এই সব তুচ্ছতাকে স্পর্শ করতে তুমি দাওনা, সেখানে প্রয়োজনকে ছাপিয়ে উঠেছে ভালবাসা। অপরদিকে আমি আমার দ্বিধায় লজ্জিত হই, সংকুচিত হই, হই বিমূঢ়। না, আমি একে অন্যায় ভাবি না, ভাবি না অনৈতিক গর্হিত কিছু। জানি, এতে আছে স্বর্গীয় প্রেম, পবিত্রতার আলোক,

তবু মনের কোণ থেকে অযথা উঁকি মারে সংস্কার—আমি হয়েছি তার ক্রীতদাসী—কিছুতেই মুক্তি পাই না, তবে ঘুচেছে, ঘুচে যাচ্ছে অনেক কিছুই। জানি একদিন সবই ঝেড়ে ফেলতে পারব। এই মূহূর্তে তোমাকে পাশে পেতে বড় মন চায়! [পৃ. ১৩৩][৩৭]

ফুলকির কোনও এক অজ্ঞাত অবচেতনের প্রভাবে এই ভালোবাসা একদিন রাত্রির ভালোবাসায় দাঁড়াবে, দিবালোকে এটা কিছুতেই মানতে পারিনে—যদিও জানি ভালোবাসার অমোঘ নিয়মে সেই দিকেই আমরা যাচ্ছি যদিও পাশাপাশি দাঁড়ালে সুতীব্র কামনার দহনে বুক জ্বলে ওঠে। [পৃ. ১৬৯][৩৮] এই কথাটির মধ্য দিয়ে আমরা ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণের চেতন ও অবচেতনের ভাবনার প্রভাব লক্ষ করা যায়। এরপর মূহূর্তেই ফুলকিকে বলতে শোনা যায়—

দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল
বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামল।

সে বলছে—

> আমি এখন রাত্রে স্বপ্ন দেখি আর দিনেও স্বপ্ন দেখি, রাত্রে আমরা পরস্পরের কাছাকাছি সামাজিক দৈহিক সকল প্রকার সংকটই আমরা কাটিয়ে দুর্গম পথ পাড়ি দিচ্ছি। মনের ভিতর তখন অনুভব করি, আমরা সুখী হব, কত সুখী সকলের চেয়ে সুখী হব আমরা কারণ ভালবাসায় আমাদের নবজন্ম হয়েছে—আমি স্বপ্ন দেখি ''বিবাহিত'' জীবনে জন্ম নেবে নতুন এক সংসার সদা সুখী ভালবাসায় পূর্ণ—কিন্তু তার অনেক দেরি অনেক অনেক অনেক দেরি—এইটেই বড় সত্য। [পৃ. ১৩৩][৩৯]

অন্যদিকে শামিমের অমিতার (ফুলকি) প্রতি ভালোবাসা প্রথম অবস্থায় ছিল মন, পরে ধীরে ধীরে তা কামুকতায় পর্যবসিত হয়েছিল। সে চিত্রও লেখক এঁকেছেন অমিতার (ফুলকি) স্মৃতিপটের মাধ্যমে। অমিতাকে (ফুলকি) সিঁদুর পরিয়ে শামিম এক বন্যজন্তুর মতো হিংস্রভাবে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সেই ভয়ঙ্কর রাতের বর্ণনা দিয়েছে অমিতা (ফুলকি)—

> শামিম আবদার করলে, আমার শরীরটা তুমি বিজলির আলো দেখতে চাও। আমি আঁতকে উঠেছিলাম। না না, শামিম না। তোমার চোখে মুখে রক্তের স্রোত তখন লজ্জায় সংকোচে উল্টোদিকে বইতে শুরু করেছে। না শামিম, আলোয় না না না। তুমি তখন আলো নেভালে। তারপর অন্ধকারে—তোমার নিদারুণ অস্বস্তির মধ্যেও তুমি আমাকে ধীরে ধীরে অনাবৃত করলে শামিম। আর তারপরেই আমার উপর হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লে। সে কি হিংস্রতা! সে কি বন্যতা। তুমি আমাকে কি একেবারেই ভুলে গিয়েছিল শামিম? একেবারে? আমি তো শরীর, আমার মন, আমার সত্তা সবই তোমাকে নিবেদন করে রেখেছিলাম। সেটাও কি তোমার মনে পড়ল না? উঃ কি যন্ত্রণা, কি যন্ত্রণা! কোথায় গেল তোমার এত কোমলতা, সারা সন্ধে যার মধ্যে আমাকে ডুবিয়ে রেখেছিলে? কোথায় গেল আমার প্রতি তোমার এত মমতা? তুমি কি আমাকে একেবারে ভুলে গিয়েছিলে শামিম, তোমার ফুলকিকে? আমার কুমারীত্বকে তুমি যখন সবলে ফালা ফালা করে ছিঁড়েছিলে, তখন, তখন কি তোমার একবারও মনে পড়ল না, যে মেয়েটি পুরুষালি হিংস্র রথের তলায় চাপা পড়ে পিষ্ট হচ্ছে, নিপীড়িত হচ্ছে, ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে, সে নারী। সে মানুষ। সে তোমারই প্রেমিকা, একবারও তোমার এ কথা মনে পড়ল না, শামিম। শামিম এই হিংস্রতা, এই দস্যুতার জন্য আমি তৈরি ছিলাম না। যন্ত্রণায় আমি কঁকিয়ে উঠছিলাম। প্রতি মূহূর্তে ভাবছিলাম এই বুঝি তোমার উন্মত্ততা কমবে। কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই তুমি নিষ্ঠুরতর হয়ে উঠেছিলে। [পৃ. ১৪৩][৪০]

সন্ধ্যার রঙিন স্বপ্ন রাত পোয়াতে না পোয়াতেই ফুলকির কাছে বিভীষিকা হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে ফুলকির মনে দাম্পত্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রশ্ন জেগে উঠেছিল। 'নারীত্বের কি পুরুষের পদতলে নিষ্ঠুরভাবে পিষ্ট হওয়াই নিয়তি? এই কি বিবাহ?' [পৃ. ১৪৩][৪১] এত কিছুর পরও ফুলকি শামিমকে ভালোবেসেছিল। কিন্তু অমিতা (ফুলকি)-র জীবন পরিবর্তিত হতে থাকে তার জীবন থেকে শামিম চলে যাবার পর থেকে। তারপর অমিতার

জীবনে এসেছে সমীরেন্দ্র নামে এক পুরুষ। যিনি অমিতার প্রথম স্বামী। সমীরেন্দ্র যে কতটা অ্যাম্বিশাস, কত স্বার্থপর ছিল সেটা বুঝতে পেরেছিল অনেক পরে। শুধু তাই নয় আদালতের রায় খোকাকে অমিতার কাছ থেকে দূরে নিয়ে গিয়েছিল। অমিতার জীবনে পৃথ্বীশ এসেছিল একটা ঝড়ো হাওয়ার মতো। পৃথ্বীশ ছিল একজন আর্টিস্ট, গ্রিক অ্যামেচার ফটোগ্রাফিতে তার বেশ নাম ছিল। পৃথ্বীশ মনে মনে অমিতাকে ভালোবেসে ফেলেছিল। তার আমরা অমিতার কথার মধ্য দিয়েই আভাস পাই—

> পৃথ্বীশের 'কলকাতার যশোদা' সেবারই অ্যামেচার ফটোগ্রাফার্স গিল্ডের বার্ষিক প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল। কিন্তু তার দুমাস আগেই পৃথ্বীশ পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছে। সে আত্মহত্যা করেছিল। গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছিল সিলিং থেকে। পায়ের কাছে একটা নোট, ''যতদিন বাঁচব, এ বিরহযন্ত্রণার আর শেষ হবে না জানি। তাই এইখানেই দাঁড়ি টেনে দিলাম।' এই চিরকুট কার উদ্দেশ্যে লেখা অমিতা ভালই জানত। কিন্তু কাউকেই বলতে পারেনি একথা উঃ কী যন্ত্রণা! পৃথ্বীশ কতদিন তাদের বেনেটোলার বাসায় এসে তার কত কাজ করে দিয়েছে। উনুন ধরিয়ে দিত। ভাতের ফেন গেলে দিত। বা অমিতা যখন রান্নাবান্না করত, কোনও কিছুর অভাব পড়ে গেল চট করে সেটা কিনে এনে দিত। কয়েকবার বাড়ি ভাড়ার টাকা জোগাড় করে এনে দিয়েছে পৃথ্বীশ। পৃথ্বীশের এমনিতে রোজগার-পাতি তেমন ভাল ছিল না। অমিতা জানে, তার জন্য পৃথ্বীশ কয়েকবার কয়েকটা ভাল ছবি জলের দরে বিক্রি করে দিয়েছে। একবার তো পৃথ্বীশের ছবি বেচা টাকায় খোকার জীবন ফিরে পাওয়া গিয়েছিল। 'কলকাতার যশোদা' কেমন বিবর্ণ হয়ে এসেছে। হবে না? সে কি আজকের কথা! বছর চল্লিশ তো পার হয়ে গেল। [পৃ. ৬৭][৪২]

এরপর অমিতার জীবনে একে একে এসেছে যোগীশ্বর তার দ্বিতীয় স্বামী, মেয়ে বিন্তি এবং লোকনাথ তার তৃতীয় স্বামী। কিন্তু তারা এখন আর তার পাশে কেউ নেই। এমতো অবস্থায় অমিতার কাছে পৃথিবীটা ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে শুরু করে। অমিতার মনে হতে থাকে—

> পৃথিবীটা ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে শুরু করেছে তার দুচোখের সামনে। অমিতার মনে হল, হঠাৎই মনে হল, এই তো সেই তার ধাইয়ের মুখ। সে তো তা হলে তাকে ছেড়ে থাকেনি। না, ছেড়ে থাকেনি। সেই জন্মের মুহূর্ত থেকেই তো তার ধাই, ধাত্রী, ধরিত্রী, তার প্রিয়তম পৃথিবী তাকে ধারণ করে আছে। এক মুহূর্তের জন্য তো সে, একমাত্র সেই, তার কাছ ছাড়া হয়নি। আশ্চর্য, এটা কেন সে বুঝতে পারেনি এতদিন? [পৃ. ৫২][৪৩]

হঠাৎ করে অমিতার মনে মাতৃস্নেহ জেগে ওঠে। তার খোকার কথা, মেয়ে বিন্তির কথা মনে পড়তে থাকে। সে মন্টুর মাকে বলতে থাকে ছেলে 'খোকা' আর মেয়ে 'বিন্তির' কথা—

''আমেরিকায়! ওহাইওতে। তার বাবার সঙ্গে সেই ছোট বয়সেই চলে গিয়েছিল। সমীরেন্দ্র, তার প্রথম স্বামী, খোকাকে তার কাছ থেকে ভুলিয়ে, নিয়ে চলে গিয়েছিল। না ভুলিয়ে নয়, কোর্টে দরখাস্ত করে তার প্রথম স্বামী তার প্রথম সন্তানকে নিজের কাস্টডিতে নিয়ে গিয়েছিল। বিচারক সমীরেন্দ্রের আবেদনই মঞ্জুর করেছিলেন। মায়ের কাস্টডি ছেলের মেন্টাল হেলথের পক্ষে সহায়ক নয়। ভুলিয়ে নয়, সমীরেন্দ্র খোকাকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। বাপের কাছেই সে মানুষ হয়েছে তো! মাকে তার দরকার হয়নি।" [পৃ. ৫৫][৪৪]

> বিন্তি। তার দ্বিতীয় পক্ষের মেয়ে। সে খুব ভাল ছাত্রী ছিল। এখন টরেন্টোতে থাকে। কানাডায়। নিজে যেমন ভাল ছাত্রী ছিল বিয়েও করেছে তেমনি ব্রিলিয়ান্ট এক ছেলেকে। ওদের ছেলেমেয়েরাও পড়াশুনায় খুউব ভাল। বিন্তি তার ল্যাবরেটরির গবেষণায় ঘরসংসার এখানে ওখানে পড়াতে যাওয়া লেকচার নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে যে, এদেশে আসতে আর সময় পায় না। আগে চিঠি লিখত মাঝে মধ্যে কখনও বা টেলিফোন করত। এখন সব বন্ধ। শুধু কার্ড আসে ক্রিস মাসে আর নিউইয়ারে। মাতৃস্নেহ! [পৃ. ৫৫][৪৫]

হ্যাঁ অমিতার আজ সবাই আছে, কিন্তু মন্টুর মার কথাটাই এখানে সবথেকে সত্যি 'সবাই আছে আবার কেউ লাই।' এক্ষত্রে অমিতার (ফুলকি) প্রথম যৌবনের যাকে ঘিরে তার ভালবাসা গড়ে উঠেছিল সেই শামিমই তাকে একদিন বলেছিল, যা আজ তার বারে বারে মনে হচ্ছে—

> পৃথিবীতে দয়া মায়া স্নেহ প্রেম সব বুঝি ওই একটি অ্যাটম বোমা ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছে। মানুষের মন এবার মরুভূমি হয়ে যাবে। অমিতা, মানুষ মরুভূমি হয়ে যাবে। [পৃ. ১১৪][৪৬]

এজন্যই অমিতা আজ নিজের জীবনটাকে ঘুণপোকায় খেয়ে যাওয়া একটা অসাড় বস্তুর সঙ্গে তুলনা করছে।

> ঘুণপোকারা দরজাটাকে খেয়েই চলল আর দরজাটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জীর্ণ হতে লাগল। সবাই প্রতীক্ষা করছি, জীর্ণ হতে হতে জীর্ণ হতে হতে কবে একদিন দরজাটা মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে।
>
> ... ...
>
> দরজাটার সঙ্গে আমি আমার খুব মিল দেখি বলে। আমার শরীরটাকে ক্যানসারে কুরে কুরে খাচ্ছে। এত যন্ত্রণা যে এক মুহূর্তও বাঁচতে ইচ্ছে করে না। তবু মৃত্যু না আসা পর্যন্ত মরতে আমার ইচ্ছে নেই। অথচ ইচ্ছে করলেই আমি মরতে পারি। আমার কাছে ব্লেড আছে, ঘুমের ওষুধ এত পরিমাণে আছে যে, তা দিয়ে একটা বাঘকে অবধি চিরতরে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া যায়। [পৃ. ৩২][৪৭]

এক্ষেত্রে 'প্রেম নেই' উপন্যাসে ফটিক ছবিকে উদ্দেশ্য করে যে কথা বলেছিল তা প্রাসঙ্গিক বলেই মনে হয়।

> শূন্যতা কাছের মানুষকেও কত দূরে সরিয়ে দিতে পারে। [পৃ. ৩৪২][৪৮]

দেশের সাধারণ মানুষেরা স্বাধীনতা সংগ্রামে লড়াই করার পাশাপাশি তাদের সংগ্রাম চলছিল বেঁচে থাকার জন্য। স্বাধীনতা-উত্তর সেই সংগ্রাম লড়াইয়ে পরিণত হয়। স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়, উদ্বাস্তু সমস্যা এবং পার্টিশান পরবর্তী আগত উদ্বাস্তুরা সমস্যাটকে আরো জটিল করে তোলে। সেই সঙ্গেই যুক্ত হয় স্বাধীনতা-উত্তর নানান রাজনৈতিক জটিলতা। এছাড়া বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রমিক সংগঠনগুলি রাজনৈতিক জটিলতাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছিল। এর প্রভাব গিয়ে পড়েছিল মানুষের মনে। ফলে চরিত্রগুলিকে জটিল করে তুলেছিল। এই জটিলতার প্রধান কারণ মানুষের মন। যা শুধুমাত্র চরিত্রকেই জটিল করে তোলেনি, সেইসঙ্গে সম্পর্কগুলিকে করে তুলেছে জটিল থেকে জটিলতর। আর এই সমস্ত জটিলতাকে খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন লেখক গৌরকিশোর ঘোষ তাঁর 'উপন্যাস সংগ্রহ' এবং 'গল্প সমগ্রের' উপন্যাস ও গল্পগুলিতে। রাজনৈতিক জটিলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে অর্থনৈতিক নানান জটিলতা তৈরি হতে থাকে সমাজে বুকে। সমাজে শিক্ষিত বেকারত্বের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। জীবিকা উপার্জনের জন্য ঘরের মেয়েদেরকে নামতে হয়েছিল নানা পেশায়। ধীরে ধীরে মানুষের মানসিক অবস্থারও অবস্থান্তর ঘটে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্যের যেমন গতি পরিবর্তিত হতে থাকে, ঠিক একই রকমভাবে মানুষের কামনা-বাসনা-লোভ-লালসার ধারণাও পরিবর্তিত হতে থাকে। আর এই পরিবর্তিত ধারণার বিশ্লেষণ করেছেন লেখক 'উপন্যাস সংগ্রহের' এক-একটি ঘটনা ও চরিত্রের মধ্য দিয়ে। উপন্যাস সংগ্রহের উপন্যাসগুলিতে ফুটে উঠেছে বিংশত শতকীয় কিছু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির পরিবর্তিত মনস্তাত্ত্বিক অবস্থানের চিত্র। উপন্যাসগুলির নামকরণের মধ্য দিয়েই লেখক সমাজের বিভিন্ন মানুষের অন্ধকারের অতলে লুকিয়ে থাকা মনস্তত্ত্বকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

বিংশ শতাব্দীতে পুঁজিবাদের ফসল হিসেবে জন্ম নিয়েছিল আধুনিকতা। আর এই আধুনিকতার শবদেহের উপরই জন্ম হয়েছিল হাংরি-আন্দোলন। এই বিষয়টি সম্পর্কে কিছু না বললে, গৌরকিশোর ঘোষের উপন্যাসও গল্পে মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনের আলোচনাটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। গৌরকিশোরের উপন্যাস ও গল্পগুলি পড়তে পড়তে আমাদের মনে হয়েছে যে, তিনি হাংরি আন্দোলনের দ্বারা কোনো না কোনো ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলনে। স্বাধীনতা উত্তর-পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন আন্দোলন যে সংগঠিত হয়েছিল, তার কথা আমরা আগেই বলেছি, এর পাশাপাশি এক সাহিত্যিক আন্দোলন শুধু সাহিত্য ভাব ধারাকেই নয়, সেই সঙ্গে তৎকালীন বাংলার ভাবাদর্শেরও এক ধরনের পরিবর্তন আনতে চেয়েছিল হাংরির আন্দোলনকারীরা। হাংরি আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯৬৩-৬৪ সালে। এই আন্দোলন

শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্যের জগতে চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। বিশ্বের আলোড়ন সৃষ্টিকারী এবং সাহিত্যের নতুন পথ খননকারী আন্দোলনগুলির চেয়ে এটি কোনোভাবেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁরা চিন্তা-চেতনা এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে নতুন আন্দোলন সৃষ্টি করার পাশাপাশি সমস্ত ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। হাংরি আন্দোলনকারীরা চেয়েছিলেন যৌনতার স্বাভাবিক প্রকাশ ঘটাতে। কারণ তাঁরা মনে করতেন যৌনতাই পারে স্বাধীনতাকে আরো বড়ো পরিধিতে নিয়ে যেতে। হাংরিদের যৌনতা বিষয়ক ধারণাকে অনেক সমালোচক সমালোচনা করে বলেছেন যে, ''হাংরিদের ক্ষুধা আসলে বিকৃত যৌনতার ক্ষুধা।'' এ সম্বন্ধে হাংরি আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ শৈলেশ্বর ঘোষ বলেছেন যে—

> আমরা জানি এ ক্ষুধা নিজেকে দগ্ধ করে নিজের সত্য আবিষ্কারের ক্ষুধা। আজ সমালোচক বলছেন, হাংরি সাহিত্যই নতুন বাংলা সাহিত্য। যদিও এই সাহিত্যের গঠন প্রক্রিয়া, চেতনার স্তর এবং ভাষা সাধারণ পাঠকের কাছে অনেকটা অপরিচিত। বাংলা সাহিত্যের বদ্ধ অঞ্চলটাকে এবং কনফরমিস্টদের প্রতিরোধকে আমরা ভেঙে ফেলেছি বললে আজ আর অহংকার করা বোঝায় না, আরও একটা কথা স্পষ্ট করে বলা দরকার যে হাংরি সাহিত্য কারো কোনো ফতেয়া থেকে কোনো ইস্তেহারের নির্দেশ থেকে সৃষ্ট নয়। নিজেদের জীবনই এর উপাদান। [ক্ষুধার্থ হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের সংকলন, পৃ. ৮][৪৯]

হাংরি আন্দোলনকারীরা ভিক্টোরিয় নীতিবোধের অবদমন থেকে যৌনতাকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তাঁরা মনে করতেন মানুষের অস্তিত্বের স্বাধীনতার অন্যতম শর্তই হল যৌনতার মুক্তি। হাংরি আন্দোলনকারীরা মানুষের সংবেদনার অবরুদ্ধ দরজাগুলো খুলতে চেয়েছিলেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন অবরুদ্ধ দরজাগুলি খুলতে না পারলে নতুন সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। হাংরি আন্দোলনকারীরা বলেছিলেন—

> ক্ষমতার গর্ভাশয়ে যে চেতনার জন্ম তা আমাদের কাছে অসৎ। অবদমিতের চেতনাই আমাদের কাছে সৎ। তার মধ্যেই সত্য আছে। আর ক্ষমতার গর্ভে যে চেতনার জন্ম তার মধ্যে আছে অন্যকে শোষণ করার এবং ধ্বংস করার আকাঙ্ক্ষা। [সমগ্রন্থ, পৃ. ১৪][৫০]

হাংরি আন্দোলনকারীরা মূলত ছিলেন স্বাধীনতার সময় পূর্ববঙ্গ থেকে পালিয়ে আসা উদ্বাস্তু। হাংরি আন্দোলনের এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলোকে সামনে রেখে যদি আমরা গৌরকিশোর ঘোষের উপন্যাস সংগ্রহের উপন্যাসগুলিকে সঠিকভাবে বিচার করি, তাহলে দেখতে পাব যে উপন্যাসগুলিতে লেখক যে যৌনচেতনার কথা বলেছেন, সেখানে 'ক্ষুধার্তর' সমমনস্কতার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে একথা ঠিক যে, গৌরকিশোর নিজে কোনোদিন প্রত্যক্ষ ক্ষুধার্ত বা হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু এই আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল তাঁর সাহিত্য ও জীবনে। গৌরকিশোরও চেয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যে নতুন রীতির সাহিত্য রচনা করতে। মানুষের মনে যৌন প্রবৃত্তির চাহিদাকে বাদ দিলে একজন মানুষের প্রকৃত অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ বলে মনে করা যায় না। তাই তাঁর উপন্যাসে খোলামেলা যৌন প্রবৃত্তিকে নিয়ে আলোচনা লক্ষ করা যায়। লেখকের 'এই দাহ' উপন্যাসটির নামকরণের মধ্য দিয়েই আমরা দেখতে পাই কোনো একজন ব্যক্তির মনস্তাপ বা মনের সন্তাপ। কারণ এই 'দাহ' শব্দটির মধ্যে রয়েছে মানুষের মনের নানা ধরনের প্রবৃত্তির ধারণা। 'দাহ' শব্দটিকে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' গ্রন্থে নানা অর্থে বিশ্লেষিত করেছেন। যেমন, 'দাহ'—(ক) দহন ; (খ) জ্বলন, সন্তাপ ; (গ) আন্তরিক যাতনা ; (ঘ) মনস্তাপ। দেহের উত্তাপ। [বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, সাহিত্য সংসদ][৫১]

গৌরকিশোর ঘোষের 'এই দাহ' উপন্যাসটি জুড়ে সেই একজন মানুষের মনস্তাপ লক্ষ করা গেল। কোনো ঘটনা বা ব্যক্তির সঙ্গে তার সম্পর্ক যা তাকে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত কুড়ে কুড়ে খেয়ে চলেছে ঘুণপোকার মতো। উপন্যাসটির সেই লোকটি হল গোলক। যার মনস্তাত্ত্বিকতাই সমগ্র উপন্যাসটির বিষয়বস্তু বলে মনে হয়েছে আমাদের। উপন্যাসটিতে আমরা দেখতে পাই যে, গোলক দেড় বছর কাঁচরাপাড়া যক্ষ্মা স্যানাটোরিয়ামে ছিল। সুস্থ হয়ে যখন সে ফিরে আসে, তারপর থেকেই তার মনের এবং দেহের দাহ বাড়তে থাকে। দেহের দাহকে জুড়াবার জন্য সে

দুটো সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এই সম্পর্কগুলোই এর মনের দাহকে বাড়িয়ে তোলে এবং শেষপর্যন্ত আত্মহত্যার পথকে বেছে নিতে বাধ্য করে। গোলক স্যানাটোরিয়ামে যাওয়ার আগেও তার সাথে একজনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। অর্থাৎ গোলক জীবনে যৌবনকাল থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত তিনজন রমণীর সঙ্গে সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে দেহের দাহকে জুড়াবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সেই দাহ পরিপূর্ণভাবে তৃপ্ত হওয়ার আগেই তার জীবনে ঘটে গেছে নানা ধরনের ঘটনা। গোলকের মনের দাহকে বাড়িয়ে তুলেছিল 'মনোরমা'। যে তাকে তার দেহটা দিয়েছিল, কিন্তু ভালোবাসা দিয়েছিল তার স্বামীকে। মনোরমার এই মানসিক অবস্থানটি বুঝতে পারার পর গোলকের মনে তৈরি হয় এক মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন। তাই উপন্যাসে গোলককে বলতে শোনা যায়—

> মনোরমার এত নিবিড় সান্নিধ্যে এসে, এত ঘনিষ্ঠ হয়েও আমি বুঝতে পারিনি, এবং মুহূর্তের জন্যেও টের পাইনি, মনোরমা অকাতরে শুধু তার দেহটাই বিলিয়ে দিয়েছিল আমাকে। অথচ তার মন, তার প্রেম, কৃপণের ধনের মতো সঞ্চয় করে রেখেছে তার স্বামীর জন্য। শুধু স্বামীর জন্য।
>
> যখন টের পেলাম, তখন, তৎক্ষণাৎ কেমন যেন হীন মনে হল নিজেকে। যেন অনধিকার প্রবেশ করেছি মনোরমার দেহে। নিজের দিকে নজর পড়ল আমার। ঠাণ্ডা চোখে মনোরমাকে দেখতে চেষ্টা করলাম। প্রচলিত আইন-কানুন, সংস্কার, পাপ-পুণ্য দিয়ে গড়া পৃথিবীটা জ্বলজ্বল করে ভেসে উঠল আমার বুদ্ধি-বিবেচনায়। লজ্জায় ঘৃণায় অনুশোচনায় যেন আমার মাথাটা মাটিতে মিশে গেল। নিজেকে লুকিয়ে ফেললাম। পারলে নিজের কাছ থেকেও আড়াল করে রাখতাম। [এই দাহ পৃ. ৯][৫২]

মানুষ যে প্রবৃত্তির দাস তা ধীরে ধীরে গোলক বুঝতে পারে। সেও যে প্রবৃত্তির কাছে হার মেনেছিল, সেটা সে অনুধাবন করতে পারে মনোরমার সঙ্গে সম্পর্কের পর থেকে। গোলকের মতো মনোরমাও ছিল যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত। গোলকের নিজের সঙ্গে নিজের মনের দ্বন্দ্ব চলেছে প্রতিটি মূহূর্তে। আর সেই দ্বন্দ্বে তার মন বলে উঠেছে—

মনোরমার ওই কীটদষ্ট দেহটার মধ্যে কী এমন শক্তি ছিল গোলক, যা তোমাকে বার বার ভাসিয়ে নিয়ে গেছে? তার যখন খুশি সে তোমাকে নাচিয়েছে, খেলিয়েছে, প্রয়োজনে কাজে লাগিয়েছে, অপ্রয়োজনে জীর্ণ বস্ত্রের মতো পরিত্যাগ করেছে।[৫৩]

এর পরিপ্রেক্ষিতে গোলকের সচেতন সত্তা বলেছে—

> না না, মনোরমা আমাকে ছাড়তে চায়নি। আমি মনোরমার সত্তারই একটা অংশ যেন হয়ে গিয়েছিলাম। মনোরমা আমারও অনেকখানি ছিল। আর যে যাই বলুক, মনোরমা আমার সঙ্গে একটুও ছলনা করেনি। যা সে দিতে পারত, যা তার সাধ্য ছিল, তা-ই আমাকে দিয়েছে, দিয়ে সে তৃপ্তি পেয়েছে। কিন্তু আমার দাবি আরও উচ্চগ্রামে বাঁধা ছিল। আমি তার সব চেয়েছিলাম, শুধু দেহটাই নয়। কিন্তু মনোরমা কী করবে! তার ওই দেহটি ছাড়া আর সব কিছুর দাবিদারই তো ছিল তার স্বামী। তার দেহের দাবিদার কেউ ছিল না। আর সেখানেই তো তার জ্বালা, তার দাহ। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৪৩-৪৪][৫৪]

মনোরমার সঙ্গে গোলকের অন্তরঙ্গতা যত বেড়েছে ততই মনের দাহের তাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। মনোরমার সঙ্গে গোলকও পুড়েছে। প্রথমদিকে গোলক মনোরমার পরিবারকে সুখী বলে মনে করত। কিন্তু এই পরিবারের গভীরে লুকিয়ে থাকা অসুখকে বুঝতে পারেনি। মনোরমার সংস্পর্শে এসে তার মনে হয়েছে, মানুষের চোখ কত ভুল দেখায়। শুধু সুখ বলে সংসারে কিছু নেই। একসময় গোলক ঝর্নাকে পায়নি বলে তার মনে দুঃখ বোধ হয়েছে। কিন্তু আজ তার কাছে তা শুধু শূন্য বলেই মনে হয়। মনোরমা যখন তার মনের দাহ-র কথা বলে তখন গোলকের কাছে সুখের ধারণার পরিবর্তন হতে থাকে। মনোরমা যখন বলে—

তুমি আমার জ্বালা মিটিয়েছ গোলক। আমার দেহের দাহে শান্তির প্রলেপ লেপে দিয়েছ। পরিপূর্ণ বাঁচার স্বাদ তোমার কাছ থেকেই আমি পেয়েছি। আমার নারীজন্মের চরম সুখের সন্ধান তুমিই আমাকে দিয়েছ; যার জন্য আমি কাঙাল হয়ে উঠেছিলাম। আমি যে সেরে গিয়েছি, বেঁচে উঠেছি, মায়া-মমতা-স্নেহ শুধু নিতেই আসিনি, দিতেও এসেছি

আমাকে উজার করে, আমার স্বামী একথা বুঝতে পারেনি। দেবার মধ্যেও যে সার্থকতা আছে, পূর্ণতা আছে, তোমার কাছ থেকেই তা জেনেছি। তুমি আমার পঙ্গুত্ব ঘুচিয়েছ। কী করে বলব তোমাকে ভালবাসি না। এ কি এক কথায় রায় দেওয়া যায়? বলো! [সমগ্রন্থ, পৃ. ৫৪][৫৫]

মনোরমা গোলককে পেয়ে মনের দাহ মিটিয়েছে। কিন্তু গোলকের মনে প্রথম থেকেই যে দাহ সৃষ্টি হয়েছিল তা ঝর্না, মনোরমা, চারুলতা কারো দ্বারাই তা মেটেনি। গোলকের প্রথম মনের দাহটাই ছিল বিয়ে করার মধ্য দিয়ে। যা ঝর্নার মধ্য দিয়েও মেটেনি কারণ ঝর্নার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল বঙ্কিমের সাথে। অন্যদিকে মনোরমা ছিল বিবাহিত রমণী। সে তার সমস্ত ভালোবাসা উজার করে দিয়েছিল স্বামী ও পরিবারকে। শেষপর্যন্ত চারুলতার মধ্য দিয়ে তার অপূর্ণ মনের দাহকে মেটাতে চেয়েছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত সে আশাহত ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছে। পুরুষদেরকে বেকায়দায় ফেললে মেয়েদের চোখে হামেশা যে ঝিলিক খেলে যায় তা প্রথম গোলক লক্ষ করেছিল ঝর্নার মধ্যে। গোলকের মনে পড়তে লাগল—'শুধু ঝর্ণার চোখে নয়, মুখের ডৌলে, ঠোঁটে, দেহের প্রতিটি রেখায় স্পষ্ট এক স্পর্ধিত অস্বীকার ফুটে উঠল।' [সমগ্রন্থ, পৃ. ১৬][৫৬] ঝর্ণা তার যৌবনে মনের দাহ গোলকের মাধ্যমে মিটিয়েছিল। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল চারুলতা। চারুলতা মূলত ছিল দেহপশারিনী। ছোটো থেকে সে ব্রহ্মচারী বাবার অনাথ আশ্রমে পালিত হয়েছে চারুলতা। ব্রহ্মচারী বাবাই চারুলতাকে প্রথম শাড়ি দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে দিয়েছিলেন বৈজ্ঞানিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করলে গর্ভসঞ্চারের দায় কীভাবে এড়ানো যায় হাতে-কলমে সেই শিক্ষা। শিক্ষাটা যে কত মূল্যবান, পরবর্তী জীবনে পদে পদে টের পেয়েছে চারুলতা। যা-কিছু পেয়েছে চারুলতা, বিভিন্ন স্তরের লোকেদের কাছ থেকে, তা দু'দিনের আশ্রয়ই হোক, দু'পাতার বর্ণ পরিচয়ই হোক, কি বৃত্তিশিক্ষায়ই হোক, কি কোনও কাজকর্মের ব্যাপারই হোক, তার জন্য চারুলতাকে বেতন দিতে হয়েছে, দেহের মূল্যে। তখন থেকেই চারুলতা দৃঢ়ভাবে জানে যে, পৃথিবী অবৈতনিক নয়। সে এটা জেনেছে যে, ভদ্দরলোকের আঁতে ঘা লাগলে তারা কিন্তু ছোটলোকেরও অধম হয়ে যায়। এই চারুলতার কাছেই একদিন গোলক ও মনোরমা ধরা পড়ে যায়। তাই মনোরমাকে দেখে চারুলতাকে বলতে শোনা যায়—

> আপনার সঙ্গে বাবুর বুঝি টাকা-পয়সার লেনদেন নেই। আপনারা, ভদ্দর ঘরের মেয়েরাই এইভাবেই বাজারটা নষ্ট করে দিচ্ছেন। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৭৪][৫৭]

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় দেহের উত্তাপ জুড়াবার সাথে টাকা পয়সার লেনদেনের সম্পর্ক। এই সম্পর্ক রাষ্ট্র-সমাজ ব্যবস্থার অর্থনৈতিক কাঠমোর সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেহের উত্তাপের জ্বালার সাথে মনের দাহের একট বিশেষ সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। যা 'এই দাহ' উপন্যাসটিতে গোলক-মনোরমা ও চারুলতার ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল। গোলক-মনোরমার সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। গোলকের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে—

> তার শরীরের প্রতিটি কোষে তীব্র ক্ষুধা জেগে ওঠে, প্রবল অস্থির হয়ে ওঠে গোলক। বিগত দিনের স্মৃতিগুলির তীক্ষ্ণ দংশনে গোলক ছটফট করতে থাকে। কত নিঃসঙ্গ সে। কী ভয়ঙ্কর রকম একা! [সমগ্রন্থ, পৃ. ৫৮][৫৮]

মনোরমার ক্ষেত্রে—

> আমি অনেক বুঝেছি গোলক, আর পারিনে। পারিনে। পারিনে। সেদিন জীবনের ক্ষুধার চেয়ে স্থায়িত্বকে, নিরাপত্তাকে বড়ো বলে মনে করেছিলাম। ভেবেছিলাম তাতেই সুখ। ভেবেছিলাম স্বামীর চোখ একদিন না একদিন পড়বেই। এই চারমাস চেষ্টার ত্রুটি করিনি। কিন্তু একটুও টলাতে পারিনি। তার সদা সর্বদা ভয়, আবার যদি অসুখ করে আমার।...আমি মানুষের মতো বাঁচতে চাই গোলক। রক্ত-মাংসে গড়া মানুষের দাবি মিটিয়েই বাঁচতে চাই গোলক। চিরকাল শো-কেসে তোলা মোমের পুতুল হয়ে থাকতে চাইনে— [সমগ্রন্থ, পৃ. ৭৩][৫৯]

অন্যদিকে চারুলতার ক্ষেত্রে মানসিক মনস্তাপই বেশি করে লক্ষ করা গেছে—গোলকের আঁকা ছবিটিকে কেন্দ্র করে। তখনই তার মনের মধ্যে এক না পাওয়ার দাহ তৈরি হয়েছে।

ছবি দেখে চারুলতা চমকে উঠল। এ তো সম্পূর্ণ নতুন ছবি! তারই ছবি?

একটা মেয়ে শিথিল দেহ এলিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। পেটটা তার ঈষৎ স্ফীত। বুঝতে একটুও ভুল হয় না, সে মা হতে চলেছে। একটা হাত আলগোছে পেটের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। সন্তানকে যেন পরম মমতাভরে স্পর্শ করছে। সেই আবেশে মুখের উপর মাতৃত্বের কোমলতার ঢল নেমেছে। ঠোঁটে অপরিসীম তৃপ্তি। চোখে মধুর সম্ভাবনার প্রগাঢ় স্বপ্নের প্রলেপ। চারুলতা যে মরে গেল। এই ছবি সে নয়, সে জানে। কিন্তু তবু তার মনে হল এ যেন সে-ই। আগাগোড়া ছবিটায় কেমন পবিত্রতার ছোঁয়া লেগে রয়েছে। চারুলতা ভাবল, ছবির একটা মস্ত সুবিধে, তার জীবনে নোংরা লাগে না। ছবিখানার দিকে একমনে চেয়ে থাকতে থাকতে চারুলতার মনে হতে লাগল, সেও যেন এই ছবির মতো পবিত্র। কোনওদিন তার গায়ে কাদামাটি লাগেনি। তার ঠোঁটের পরিচিত হাসিটা মিলিয়ে গেল। মনের ভিতর কেমন যেন করছে। আনন্দ হচ্ছে। কান্না পাচ্ছে। কেমন যেন লাগছে। কেমন যেন মনে হচ্ছে, এ-চারুলতা আসল নয়, ঐ পটের চারুলতাই আসল।

তার মনে পড়ল, তিন-চার বছর আগে তার পেটেও এক সন্তান এসেছিল। তখনকার বাবু জানতে পেরে অনেক হাঙ্গামা করে সেটা নষ্ট করিয়ে দেয়। সেই সন্তান সম্পর্কে তার কোনও মমতাও জন্মায়নি। কোনও ধারণাও না। শুধু দিনকতক ভুগতে হয়েছিল বলেই সে কষ্ট পেয়েছিল। সেটা শারীরিক। এতদিন পরে সেই সন্তানই বুঝি পটের চারুলতার পেটে আশ্রয় নিয়েছে। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৬৯][৬০]

কিন্তু যখন মনোরমা ও গোলকের সম্পর্কের কথা এবং তাদের দুজনকে যখন সে একসঙ্গে দেখে ফেলে, চারুলতার কাছে গোলক সম্পর্কে ধারণা যখন স্পষ্ট হয়ে যায়। তখন গোলকের শুধুই মনে হয়েছে—

কয়লা তুলে নেবার পর খাদের শূন্যতা যেমন বালি ঢেলে ঢেলে ভর্তি করা হয়, আমার মন থেকেও তেমনি মনোরমা আর চারুলতা বেরিয়ে যাবার পর মনের শূন্যতা ভরে উঠল ক্লান্তি আর অবসাদে। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৭৫][৬১]

অনদিকে চারুলতা এক শিশি ক্লোরোফর্ম খেয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। চারুলতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। কারণ সে চারুলতাকে শুধুমাত্র মনের দাহ জুড়াবার জন্য তাকে কাছে পেতে চায়নি। সে চারুলতাকে গভীরভাবে ভালোবেসেছিল। কারণ চারুলতা ছিল তার আর্টিস্ট জীবনের প্রেরণার উৎস। অর্থাৎ 'যে-ভালোবাসা মনকে মহৎ করে। অন্তরকে বিশুদ্ধ করে, যে ভালবাসা দেহের দাহ শীতল করে, সেই ভালবাসা জন্মেছিল গোলকের মনে।' [সমগ্রন্থ, পৃ. ৭৬][৬২]

গোলক মনে মনে ভেবেছে—

চারুলতা মনোরমার কাছে হেরে গেছে। সেই পরাজয় ভুলতেই হয়তো জীবন দিয়েছে। শুধু শুধু আর একসংসারে আগুন জ্বলবে। কাজ কী? গোলক নিজের কাঁধেই

সব দোষ চাপাল। সে-ই তো দোষী। তার পাপেই মরেছে চারুলতা। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৭৬][৬৩]

নিজের মনের সঙ্গে দ্বন্দ্বে শেষপর্যন্ত পরাজয় ঘটেছে গোলকের। গোলক নিজের মনের দাহকে মেটাতে সে নিজেও এক শিশি ক্লোরোফর্ম খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। সে নিজেকে নিজের মনে প্রশ্ন করেছে—

আর কতক্ষণ বসে থাকবে, গোলক, শিশিটা সামনে রেখে? সময় হয়েছে, ছিপিটা এবারে খোল। চারটে বাজে। এত থাকতে তুমি ক্লোরোফর্ম আনলে কেন?

চারুলতা যে তা-ই খেয়েছিল। আমি তো জানি, সে কিছুদিন নার্সগিরি করেছে। এসব বিষয় সে আমার থেকে অনেক বেশি জানে। তাই, জ্বালা জুড়োতে সে যখন ক্লোরোফর্ম খেয়েছে, তখন আমিই বা তার অনুসরণ করব না কেন? আমারও তো ওই একই জ্বালা। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৭৭][৬৪]

শেষপর্যন্ত গোলক আত্মহত্যা করার থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। শেষবারের মতো গোলক চারুলতার কথা ভেবে, ক্লোরোফর্মের শিশিটা সম্পূর্ণ উপুর করে সমস্ত তরল পদার্থটুকু গলায় ঢেলে দিয়েছিল। তারপর গোলকের দেহের ও মনের সমস্ত দাহ শীতল থেকে শীতলতর হতে লাগল।

তার দেহটা একবার থর থর করে কেঁপে উঠল, একটু পরেই স্থির হয়ে গেল। আরও পরে শীতল। আর কোথাও দাহের লেশমাত্র নেই। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৭৭][৬৫]

'এই দাহ' উপন্যাসটিতে মানুষের মনের সন্তাপ, মনের দাহ, দেহের জ্বলন প্রতিটি বিষয় ঘটনার মধ্য দিয়ে গৌরকিশোর ঘোষ বর্ণনা করে গেছেন। সমগ্র উপন্যাসটি জুড়ে মনের দ্বন্দ্ব এবং মানসিক টানাপোড়েন। অন্যদিকে লেখক 'মনের বাঘ' উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সেই বাঘটির কথা বলতে চেয়েছেন, যে সবসময় কাম-লালসা দ্বারা তাড়িত হয়ে থাকে। তাই উপন্যাসের শুরুতেই লেখক বলেছেন—''বনের বাঘেই শুধু খায় না, জানো, মনের বাঘেও খায়।" উপন্যাসটিতে লেখক সমকালীন সময়ে সমাজের ভিতর বাস করা ভয়াবহ কিছু ক্ষুধার্ত যৌন প্রবৃত্তিকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। হামজা চরিত্রের মুখ দিয়ে তা বলানোর চেষ্টা করেছেন। কারণ উপন্যাসটির প্রথম দিকেই 'হামজা'কে বলতে শোনা যায়—

বাঙালিরা স্বভাবত সমকামী। হোমোসেক্সুয়াল। বয়ঃপ্রাপ্ত হবার পরও পুরুষরা পুরুষের ন্যাওটো আর মেয়েরা মেয়েদের ন্যাওটো ছাড়াতে চায় না।" তোমাদের যৌনজীবন সুস্থ সহজ নয়, অস্বাভাবিক।" [মনের বাঘ পৃ. ৮২][৬৬]

হামজা কলকাতার বিকৃত যৌনমনস্কতা নিয়েও মন্তব্য করেছে। সে বলেছিল—

তোমাদের কলকাতার সমাজে যত মা-মাসি-দিদি-বউদি-তন্ত্র, এমন আর কোথাও নেই।

এই বউদিতন্ত্র যে তোমাদের বিকারগ্রস্ত মনস্তত্ত্বের প্রতিফলন, এটার সম্পর্কেও তোমরা সচেতন নও। তোমাদের মেয়েরা দাদা ভজনা করে, তোমরা দিদি বউদি ভজনা করো। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৮৩][৬৭]

হামজা এর নাম নিয়েছিল 'বউদিকাল্ট্'। উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে ষাট-সত্তরের দশকে কলকাতায় কিছু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে যৌনতা সম্পর্কে একধরনের শুচিবায়ুগ্রস্ত সংস্কারের জন্ম হয়েছিল, আর প্রতিফলন ঘটাতে চেয়েছেন লেখক উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে। উপন্যাসটিতে 'আমি' চরিত্রটির মধ্য দিয়ে স্বয়ং লেখক কথা বলেছেন পাঠকের সঙ্গে। লেখক উদ্বাস্তুদের খবর সংগ্রহ করতেন। তাঁর সাথে সেখানে আরো একজন ব্যক্তি দিল্লি থেকে খবর সংগ্রহ করতে গিয়েছিল। তিনি হলেন রঙ্গচারী। লেখক মধ্যপ্রদেশের রুক্ষ অরণ্যে গিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে, রুক্ষ অরণ্যের মানুষদের কাছে যৌন ক্ষুধা একটা জৈব ক্ষুধা পেটের ক্ষিধের মতোই শরীরী প্রক্রিয়ামাত্র। কারণ, 'হাজার হাজার বছর ধরে এই কামুক অরণ্য অন্ধকারকে লালন করে এসেছে। এখানে কাম এক নিরাপদ গুহা। এখানে প্রেম বড় শক্ত ভিতে স্থাপিত।' [সমগ্রন্থ, পৃ. ৮৪][৬৮] এর সবথেকে বড়ো উদাহরণ হল এই বনের মেয়ে মুংরি মুণ্ডার জীবন। সে গ্রাম থেকে পণ্য বেচতে আসে সপ্তাহে দুবার ধরমকোটের বাজারে। সে বাজারে আলু বেচে, ডিম বেচে, মুরগি বেচে, তার সাথে সাথে দেহ বেচে। আর সেই পয়সা নিয়ে সে ঘরে ফিরে যায়। তার ঘরে স্বামী আছে, সংসার আছে, সে সংসার অটুট বিশ্বাসের বন্ধনে আবদ্ধ, তার বিবরণ লেখক দিয়েছেন—

আদর্শ সংসার। ওর স্বামী আর ওর মধ্যে গভীর প্রেম। প্রেম বললে কিছুই বলা হয় না, মুংরি আর ওর স্বামী বুধন দুজনে মিলে একটা সত্তা পরিপূর্ণ করেছে। ওরা ম.নস্তত্ত্ব বোঝে না। দর্শনতত্ত্বের ধার ধারে না। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৮৫][৬৯]

মুংরি ও বুধনের জীবনের গভীর জীবনদর্শনের খোঁজ পেয়েছিল সুশীলা। সে বলেছে—

জীবনটা ওদের কাছে সবচেয়ে বড়। ওরা ওদের মত করে জীবনটাকে গড়ে তুলেছে। জীবন আর অগাধ স্বাধীনতা ওরা যা কিছু মূল্য এ দুটোকেই দেয়। আর সব ওদের কাছে তুচ্ছ। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৮৫][৭০]

শহুরে মানসিকতায় বড়ো হয়ে ওঠা সুশীলা স্বীকার করেছিল, ''এই মেয়েটির কাছে আমি যা শিখেছি সেই আমার আসল শিক্ষা। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৮৪][৭১] সে আরো বলেছিল—

আমাদের ধারণাগুলো কত অসম্পূর্ণ। যৌন ক্ষুধাও যে জৈব ক্ষুধা, পেটের ক্ষিধের মতই শরীরী প্রক্রিয়ামাত্র, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে এটা প্রমাণসিদ্ধ হলেও আমরা গ্রহণ করতে পারিনি। গ্রহণ করছিনে। একজন পুরুষের অঙ্কশায়িনী

হলেই আমি সতী আর এর ব্যত্যয় ঘটলেই আমি অসতী এ নিয়ম আমরাই যে বর্জন করে দিয়েছি, তাও আমরা জানিনে। বিচ্ছেদের অধিকার, ইচ্ছামত স্বামী নির্বাচনের অধিকার আমাদের সংবিধানে গ্রহণ করেছি। তবু আমরা সেকেলে, বাতিল সংস্কারবশেই চলব। আর সব জিনিস ছেড়ে দিয়ে এখনও আমরা সব নজর একটি মাত্র স্থানে নিবদ্ধ রেখেছি। একই লোক একটি মাত্র পেটিকোটের বাঁধন খুলেছে কি না। এর ফলে জীবনটাই যে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, সেটা বোঝবার ক্ষমতাও আমাদের নেই। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৮৫][৭২]

সুশীলার মনে নানা প্রশ্নের উদ্ভব ঘটেছে। সে প্রশ্ন তার সমাজের প্রতি। সেই প্রশ্ন তার মতো শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি। সর্বোপরি সেই প্রশ্ন তার নিজেকে নিজের প্রতি। 'এক নারী কি একাধিক পুরুষের প্রেমে আসক্ত হয়েও নিষ্ঠাবতী হতে পারে না? নারী বা পুরুষের নিষ্ঠা কার প্রতি? ব্যক্তির প্রতি—না, প্রেমের প্রতি? এই গভীর অরণ্যে এসে মুংরির মুখোমুখি হয়ে সুশীলা জীবনের এক সত্যকে অনুধাবন করতে পেরেছিল। তাই তার জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে ভেবে অনুশোচনা বা যৌনতা সম্পর্কে শুচিবায়ুগ্রস্ততা শেষ হয়ে গেছে। সে মনে মনে নিজেকে নিজেই বলেছে—

> তার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তার অধ্যাপক তাকে ধর্ষণ করেছিলেন, সেজন্য সে এখন নিজেকে মোটেই অশুচি ভাবছে না। দেশ ভাগ হবার পর পাকিস্তানে একদল গুণ্ডা দুর্বৃত্ত কিছু মেয়েকে ধর্ষণ করেছে। সেইসব ধর্ষিতারা কি নিজেদের অশুচি ভেবেছে? একদল মেয়ে কলকাতায়, পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্র, সংসার প্রতিপালনের জন্য দেহ বিক্রি করছে। তারা কি নিজেদের অশুচি ভাবছে? সম্ভবত ভাবছে। সম্ভবত কেন, নিশ্চয়ই ভাবছে। সুশীলার স্বচ্ছ দৃষ্টি, মুংরির সতেজ জীবনবোধ তাদের নেই। তারা পাপের কামড়ে ভুগছে। অন্যায় জেনে অন্যায় কাজ করছে। নরকের আগুনে পুড়ছে। হয়তো এমনি পুড়ে পুড়ে তারাও একদিন সত্যে পৌঁছাবে। তাদের সত্যে তারা পৌঁছাবে, শুচি হয়ে উঠবে। নরকের আগুন আমাকেও তো কম পোড়ায়নি! [সমগ্রন্থ, পৃ. ৮৯][৭৩]

'নরকের আগুন' বলতে এখানে সুশীলা বোঝতে চেয়েছে 'মনের দাহ'কে। এর সাথে দেহের জৈবিক প্রবৃত্তির কোনো তাড়না নেই, আছে শুধুমাত্র মনের সন্তাপ ও অনুশোচনা বোধ। যৌনতা সম্পর্কে মানুষের মনে অকারণ শুচিবায়ুগ্রস্থতা, যার বিরুদ্ধে জেহাদ হেনেছিল ষাট-সত্তরের দশকে ক্ষুধার্ত বা হাংরি জেনারেশনের আন্দোলনকারীরা। গৌরকিশোর ঘোষও তাঁর পাঠক সমাজকে যৌনতা সম্পর্কে মুক্ত মনস্ক করে তুলতে চেয়েছিলেন। তাই উপন্যাসটিতে যৌনতা সম্পর্কে বদ্ধ আগলকে ভাঙতে চেয়েছিলেন। শুধুমাত্র যৌনতা নয়, প্রেম সম্পর্কেও মানুষের মনে এক ধরনের ভুল ধারণা রয়েছে। সেই ভুল ধারণাকেও ভাঙতে চেষ্টা করেছেন লেখক উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে। যৌন মনস্তত্ত্বের পাশাপাশি প্রেম মনস্তত্ত্বকেও দেখানোর চেষ্টা করেছেন লেখক। উপন্যাসটিতে হামজাকে বলতে শোনা যায়—

> এ জগতে কিছুই শাশ্বত নয়। মানুষ নিয়ত জন্মায়, নিয়ত মরে। প্রেম তো মানুষেরই। সে আবার শাশ্বত হবে কেমন করে? [সমগ্রন্থ, পৃ. ১০৯][৭৪]

এর পাশাপাশি হামজাকে আরো বলতে শোনা যায়—

> দেহাতীত প্রেম সোনার পাথরবাটি। প্রেম আবার শুধুমাত্র একটা জৈবিক অভ্যাসও নয়। নিছক একটা বাষ্পীয় অথবা সহজাত অন্ধসংস্কারও নয়। দেহ ও মনের নিবিড় মৈথুনে প্রেমের জন্ম হয়। দেহ যেহেতু পঞ্চভূতের সমষ্টি এবং পঞ্চভূত যেহেতু অনিত্য এবং মন সতত পরিবর্তনশীল, তাই প্রেম কখনও নিত্যকালের হতে পারে না, প্রেমও খণ্ডকালের। প্রেম তাই পরিণতি নয়, প্রেম একটি অবিরাম অন্বেষণ। [সমগ্রন্থ, পৃ. ১০৮-১০৯][৭৫]

অর্থাৎ,

> প্রেম মানুষের অজস্র সৃষ্টির একটি। মেয়ে মানুষের সঙ্গে বিছানায় শোয়া এবং পুত্রকন্যা উৎপাদন করা শুধুমাত্র এই বায়োলজিক্যাল অভ্যাসটুকু নিয়েই—যদিও মানুষের জীবনে এর কোনওটাই তুচ্ছ করার নয়—তবু শুধুমাত্র দেহগত এই অভ্যাসটুকু নিয়েই মানুষ তৃপ্তি পায় না। এটা গ্রহণ করার মধ্য দিয়েই সে কায়মনের আর একটা মনোরম আশ্রয় সৃষ্টি করে। এই জটিল প্রক্রিয়াটিকেই আমরা বলি প্রেম। সব মেয়ের সঙ্গেই হয়তো শোয়া যায়, সব মেয়ের সঙ্গে প্রেম হয় না। কেন? তা বলতে পারব না। [সমগ্রন্থ, পৃ. ১৭১][৭৬]

হামজার এই মন্তব্যটির মধ্য দিয়েই লেখকের গভীর মনস্তত্ত্ব ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ লেখক বলতে চেয়েছেন যে, একজন নারী ও পুরুষের মধ্যে শুধুমাত্র বায়োলজিক্যাল অভ্যাসটুকুর জন্যই তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। নারী ও পুরুষের মধ্যে যখন এক ধরনের আশ্রয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তখনই তাদের প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়ে থাকে। প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে যে সবসময় যৌন ব্যবহার থাকবে, সেটা সত্যি নয়। তাই লেখক যৌন প্রবৃত্তি সম্পর্কে সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের মনে যে ধারণার জন্ম হয়েছে সেই মনস্তাত্ত্বিকতাকেও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন উপন্যাসের সুশীলা চরিত্রটির মধ্য দিয়ে।

> শরীরের নানা ব্যবহার আছে। যৌন ব্যবহার তার মধ্যে একটি। আমার কথা হচ্ছে, এই একটা কাজের উপর আমরা অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করি কেন? এতে কি আমাদের অস্তিত্বের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় না? দ্যাখো, আমাদের ছেলেমেয়েরা যে কোনও বলিষ্ঠ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না, তার অন্যতম কারণই হচ্ছে দেহ সম্পর্কে অতিরিক্ত সচেতনতা। এটা এক মানসিক বিকারের পর্যায়ে গিয়ে পড়েছে।...চেস্টিটি রক্ষা করতে গিয়ে আমাদের পুরুষদের পৌরুষ গিয়েছে, মেয়েরা হারিয়েছে মনুষ্যত্ব। আমাদের কাছে শুধু এক নপুংসক উত্তরাধিকার, ফলে, আমরা পৃথিবীর অধিকার, জীবনের অধিকার, কর্মের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছি। শুধু কাঁদছি, আর কাতরাচ্ছি, আর হা-হুতাশ করছি ; আমাদের সব গেল গেল, সব রাখতে গেলে সব দিকে নজর দিতে হবে। [সমগ্রন্থ, পৃ. ১৪৭][৭৭]

অপরদিকে 'লোকটা' উপন্যাসে লেখক সমাজ মনস্তত্ত্বকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। উপন্যাসটির শুরুই হচ্ছে স্বাধীনতা-উত্তর কলকাতার অশান্তময় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে। সেই অশান্তির আঁচ গিয়ে পড়েছিল মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও। উপন্যাসটিতে 'লোকটা'ও তার ব্যতিক্রম নয়। উপন্যাসটিতে লেখক তাই লোকটার মনস্তাত্ত্বিকতাকেই ধরার চেষ্টা করেছেন। উপন্যাসটির শুরুই হয়েছে একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। সেই গাড়িতেই ছিল লোকটা। লোকটা ছিল একজন সাধারণ ঘরের মানুষ। কিন্তু তার মনের মধ্যে যে চাওয়া-পাওয়ার স্বপ্ন ছিল, তা কিছুটা উচ্চস্তরের। তাছাড়া যৌবনকালে যৌন প্রবৃত্তিও তাকে তাড়া করে বেড়াত। লোকটার সেই অভিজ্ঞতার কথাও পাই উপন্যাসটিতে। লোকটি মফস্বলে থাকাকালীন 'মেয়েদের নাম শুনলেই তার অধমাঙ্গ ঝিম মেরে হিম হয়ে পড়ত। [পৃ. ১৮][৭৮] সেই মানুষটি শহরে এসে পরিবর্তিত হতে থাকে। তার বর্ণনায় লেখক বলেছেন—

> মফস্বলের উপোসি এক তরুণ প্রাইভেট মাস্টারের স্থির আর একঘেয়ে জীবনে এই চারটে বেগবান প্রাণের সান্নিধ্য কী প্রচণ্ড বিপর্যয়েরই না সৃষ্টি করে তুলেছিল। [সমগ্রন্থ, পৃ. ১৯][৭৯]

এই বিষয়ে লোকটির নিজের সম্বন্ধে নিজেই বর্ণনা দিয়েছেন—

তার মফস্বলি অস্তিত্বের কাছে ওরা ছিল অন্য গ্রহের জীব। এদের সংস্পর্শে এসেই তার দুটো জীবন শুরু হল। তার একটা জীবনে এদের সান্নিধ্যের উত্তেজনা। সে এদের সহচর, ভক্ত, ভৃত্য। এদের হুকুম তামিল করতে পেরে সে কৃতার্থ হত। সুখে ভাসত। আরেকটা জীবনে এদের জন্য তার যন্ত্রণা যন্ত্রণা যন্ত্রণা। কারণ সেই গোপন জীবনে এদের সঙ্গে তার সব ব্যবধান ঘুচে যেত। সে ভুলে যেত সে সাধারণ, সে ভিড়ের মানুষ, আলাদা করে তাকে বেছে নেবার মত কোনও চিহ্ন তার নেই। তখন সে এদের সমপর্যায়ে উঠে আসত। মাঝে মাঝে এদের উপরেও সে উঠে যেত। তখন নিজেকে তার আরব্য কাহিনীর বাদশা বলে মনে হত। আর এরা তখন হারেমের বাঁদি। তার উড়ন্ত পালঙ্কের অধিকারে চারটি বাঁদিকে নিয়ে সে যথেচ্ছভাবে মনোসাধ পূরণ করে নিত। গাধার দুধ ঢেলে এরা তাকে চান করিয়ে দিত। চামর দিয়ে বাতাস করত। আঙুরের থোকা থেকে টসটসে আঙুর ছিঁড়ে ছিঁড়ে তার মুখে আলতো আলতো পুরে দিত। তারপর এক সময় বাদশাগিরি ফুরিয়ে গেলে সে অশেষ যন্ত্রণার সাগরে ডুবতে ডুবতে ছটফট করত। [সমগ্রন্থ, পৃ. ১৯১][৮০]

লোকটার বীরত্ব ঘুচে যেত, কলকাতার তথাকথিত যণ্ডামার্কা ছেলে ছোকরার শাসানিতে। তার বিবরণ রয়েছে উপন্যাসটিতে—

চার চারটেকে শালা একা শান্টিং দিচ্ছ, আর, আর আমরা বসে বসে আঙুল চুষছি। ইয়ারকি! আবে—" আবার তার বুকে, মুখে, পেটে সেই ষণ্ডাটা পরপর গোটাকতক ঘুষি ঝাড়ল। তারপর তার কলার ধরে তাকে শূন্যে তুলে আচ্ছা করে ঝাঁকাতে লাগল। তার দম আটকে এল। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল। সে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল, ''আমাকে ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন—" কিন্তু খড়খড়ি ছাড়া কোনও আওয়াজ বের হল না। হঠাৎ সে এক সময় আছড়ে মাটিতে পড়ল। খাবি খেতে খেতে বাতাস টানতে লাগল। আঃ, বুকের যন্ত্রণা কিছুটা আরাম হল। নিঃশ্বাস টানতে এত ভাল লাগে, এই প্রথম সে জানল। [সমগ্রন্থ, পৃ. ১৯১][৮১]

অর্থাৎ, ষণ্ডামার্কা লোকটা যখন ধারালো ছুরির ফলাটা গোড়া পেড়ে চেপে ধরে হিস হিস করে বলে উঠল ''মারব এ চোপ!" লোকটি তখন শিউরে উঠল। জমাট একটা সচল ঠাণ্ডা ভয় ছুরির ফলার থেকে ধীরে ধীরে উঠে তার তলপেটের ভিতর দিয়ে মেরুদণ্ডের মধ্যে শিরশির করে এগুতে লাগল। ধীরে, অতি ধীরে। হিমপ্রবাহের মতো প্রায় গতিহীন সেই সচলতায় সে মৃত্যুর আতঙ্ক অনুভব করল। সে নড়তে-চড়তে ভরসা পেল না, নিঃশ্বাস ফেলতেও না। তার নিতান্ত অসহায় শরীরটার স্বতঃস্ফূর্ত থরথরানির সঙ্গে অবিরল ধারায় শুধু তার ঘাম ঝরতে লাগল। এইরকম মৃত্যুর আতঙ্ক আরো দুবার সে অনুভব করেছিল।

(ক) লোকটা কর্মক্ষেত্রে নিজের স্বার্থরক্ষা করার স্বার্থে সহকর্মীদের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়েছিল। তারপর লোকটার নিজেকে আস্ত একটা সং বলে মনে হয়েছিল এবং সে নিজেকে মোটা সোটা একটা টিকটিকির সাথে তুলনা করতে লাগল। অফিসে ম্যানেজারের ঘরে যাবার ডাক আসতেই লোকটি লেপটে থাকা টিকটিকির মতো সেও নিথর হয়ে বসে রইল।

(খ) একদিন রাতে বাড়ি ফেরার পথে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টের সময় মৃত্যু যন্ত্রণাকে অনুভব করেছিল। তখন তার মনে হয়েছিল

উঃ বাতাস নেই, বাতাস নেই, বাতাস নেই। যন্ত্রণার এক ঝাঁক শকুন চোখের পলক না ফেলতেই তার উপর ছোঁ দিয়ে পড়ল, তারপর ঠোঁটে করে মহাশূন্যের উপরে তুলে নিয়ে তাকে আলতোভাবে ছেড়ে দিল। [সমগ্রন্থ, পৃ. ১৮৩][৮২]

উপন্যাসে লোকটি মৃত্যুযন্ত্রণাকে বরণ করার আগেই দু-দুবার মৃত্যুযন্ত্রনা অনুভব করেছিল। অর্থাৎ, মরার আগেই মানুষ বারে বারে মরে থাকে। সেই বিষয়টিকেই লেখক দেখাতে চেয়েছেন 'লোকটি' চরিত্রটির মধ্য দিয়ে। এছাড়া উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে লেখক তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে একজন মানুষ নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য অপর মানুষের প্রয়োজনীয়তাকে বিসর্জন দিতে পারে এবং এইরকম পরিস্থিতিতে মানুষের প্রতি মানুষের হিংসা-বিদ্বেষ-ক্রোধ কীভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তাও দেখানোর চেষ্টা করেছেন লেখক উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে। একজন মফস্বলের মানুষ শহরে এসে শহুরে নারীর সংস্পর্শে এসে যৌন চেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই সঙ্গে সংসারে ও কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির চেষ্টা এবং সেইজন্য স্বার্থপর মনোভাবের জন্ম। তাই উপন্যাসের শুরুতেই লোকটার মধ্য দিয়ে লেখক বলতে চেয়েছেন—

যতই অপ্রীতিকর হোক, সমস্যার মুখোমুখি হওয়াই মনুষ্যত্ব, পাশ কাটিয়ে যাওয়া কাপুরুষতা, তাতে নিস্তার পাওয়া যায় না। [সমগ্রন্থ, পৃ. ১৮৭][৮৩]

''গড়িয়াহাট ব্রিজের উপরে থেকে, দুজনে" উপন্যাসটির প্রস্তাবনাতে উপন্যাসটির কথক লিখছেন—

চোখ মেলতেই সোমার মনে হল আমার অসুখ নেই। আমার সব ক'টা ইন্দ্রিয় হঠাৎ তাজা, ঝরঝরে হয়ে উঠেছে। আর খোলা জানলা দিয়ে বাইরে নজর পড়ল। এক দিব্য আলোর আভায় সব কেমন সুন্দর হয়ে উঠেছে। না-শীত না-গরম বাতাস বইছে মৃদু। বহুল ফুটেছে অজস্র রংবাহার। পাখিদেরও আজ কোনও অসুখ নেই। তাদের গানের সঙ্গে আমার স্নায়ুতন্ত্রীগুলো এমন আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে সাড়া দিয়ে চলেছিল, যেন আমি এতেই অভ্যস্ত। শুয়ে থাকতে আর একটুও ইচ্ছে হল না। যেন এই মুহূর্তেই জন্মেছি, এমন একটা হালকা আর টাটকা আর মুক্ত শরীর নিয়ে আমি সেই দিব্য আলোর প্রবাহিত পথে বেরিয়ে পড়তে চাইলাম। [পৃ. ২৩৩][৮৪]

এখানে যে অসুখের কথা বলা হয়েছে, সেটা শুধুমাত্র উপন্যাসের কথকেরই নয়, সমাজের বুকে বাসা বেঁধেছে মহা অসুখ। সেই অসুখের হাত থেকে কারোরই রক্ষা নেই। তাই গল্পের কথককে বলতে শোনা যায়—''হা ঈশ্বর, আমি আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠলাম, এমনকি কেউ নেই যে এদের থামাতে পরে?

আমার আত্মস্বর অনুকরণ করে কে যেন বলল, কেউ নেই, কেউ নেই।"[পৃ. ২৩৪][৮৫]

অর্থাৎ সমাজ যে ধীরে ধীরে গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে চলেছে সেখান থেকে উদ্ধারের কেউ নেই। সমাজের মধ্যে একধরনের বিপন্নতা গ্রাস করে চলেছে। সেই সঙ্গে মানুষের মধ্যে বিব্রত মানসিকতার জন্ম হয়ে চলেছে। আমরা যে স্বাধীনতা অর্জন করতে চেয়েছিলাম। তা সম্পূর্ণরূপে আমরা অর্জন করতে পারিনি। এক মনুষ্যত্বহীন, বিবেক বর্জিত, মানবিকতা শূন্য পঙ্গু এক স্বাধীনতাকে আমরা অর্জন করেছিলাম। তাই আমাদের সমাজে ধীরে ধীরে পঙ্গুত্ব ছড়িয়ে পড়ছে। উপন্যাসটির শেষে উপসংহার অংশে 'আমি'র উত্তরপুরুষে লেখককে বলতে শোনা যায়—

> আজকের কলকাতায় এগারো বছরের ছেলে অম্লান বদনে ছুরি চালায়, চোখের পাতা একবারও কঁপে না, পনেরো-যোলো বছরের কিশোরী ফাঁদ পেতে শিকার ধরে শ্রেণী শত্রুর গলায় নলি দু'ফাঁক করে দেবার জন্য সোৎসাহে ছুরি এগিয়ে দেয়। এখানে চেহারা দেখে কে খুনে নয় তা বোঝা যাবে, এতই সোজা! আমি মশাই, যুক্তিশাস্ত্র অনুসরণ করে চলি। তাই আজকের কলকাতায় আমার কাছে সবাই খুনে। হয় সে নিজেই খুন করছে আর না হয় কোনও না কোনও ভাবে খুনেদের মদত দিচ্ছে। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৩০][৮৬]

উপন্যাসটির বিভিন্ন পরিচ্ছেদের বিভিন্ন নামকরণ করেছেন লেখক। সেই নামকরণগুলির মধ্যদিয়ে বিশ শতকের ষাট-সত্তরের দশকে কলকাতার বুকে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনার চিত্র এঁকেছেন লেখক গৌরকিশোর ঘোষ। এই সমস্ত চিত্রের মানুষ চরিত্রগুলি অবশ্যই নিম্নবিত্ত পরিবারের বা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ওপার বাংলা থেকে চলে আসা উদ্বাস্তু মানুষজনেরা। তৎকালীন সরকারের দয়ায় বা নিজের বেঁচে থাকার তাগিদে তারা নিজেরাই মাথা গোঁজার মতো জায়গা খুঁজে নিয়েছিল। কিন্তু জীবিকা অর্জনের পথ তারা পায়নি। এরফলে তরুণ যুবকেরা কিছু না পেতে পেতে তাদের মধ্যে একধরনের 'মনের দাহ' তৈরি হয়। আর সেই দাহ থেকেই তারা সমাজের বুকে নানা ধরনের অপরাধমূলক কাজ করতে থাকে। সেই ধরনের একটি চিত্র আমরা দেখতে পাই উপন্যাসটিতে। 'সেই রাতে কী ঘটে' পরিচ্ছেদটির মধ্য দিয়ে উপন্যাসের কথক ও তার স্ত্রী নেমতন্ন বাড়ি থেকে বাড়ি ফেরার পথে গড়িয়াহাটার ব্রিজের ওপর কয়েকজন বেকার তরুণ যুবক তাদেরকে ঘিরে ধরে কিছুক্ষণ উত্তক্ত করতে থাকে। শেষপর্যন্ত তারাই তাদের জন্য ট্যাক্সি ডেকে আনে। সেই ঘটনার মধ্য দিয়ে ছেলেরগুলোর বর্তমান অবস্থার জন্য সমাজ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিকাঠামো দায়ী সেইদিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন লেখক। আবার রাজনৈতিক নানা টানাপোড়েন তরুণ সমাজকে গুণ্ডাবাহিনীতে পরিণত করেছে। সেই চিত্রও এঁকেছেন লেখক উপন্যাসটির 'শচীর শেষ কথা ঃ সেল্‌ফ পোরট্রেট' পরিচ্ছেদটি লেখক তার বর্ণনা দিয়েছেন—শচী চরিত্রটির আলোকে।

> সেদিন একজন নিরস্ত্র কিশোরকে চার-পাঁচটি ছেলে মিলে খুন করছিল। প্রকাশ্য রাস্তায়। তিনতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে হঠৎ চোখে পড়েছিল আমার। না না নামিনি। পাছে হত্যাকারীরা আমাকে দেখে ফেলে, তাদের কৃতকর্মের সাক্ষী হিসেবে আমাকে চিহ্নিত করে ফেলে, সেই ভয়ে আমি তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম। [পৃ. ২৯][৮৭]

এই বর্ণনাটির মধ্যে যেমন হত্যার বিবরণ আছে। তার পাশাপাশি দেখিয়েছেন যে, কিভাবে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ প্রতিবাদহীন এক স্বার্থপর শ্রেণিতে পরিণত হয়েছে। শচী চরিত্রটি তার জ্বলন্ত উদহরণ। শচী নিজে আত্মগ্লানিতে স্বীকার করেছে—

> আমি কি এইভাবে ক্রমাগত সামাজিক অঙ্গীকার অস্বীকার করে নিজেকে বিচ্ছিন্ন বা একঘরে করে ফেলছিলেন? সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কারও পক্ষে আত্মরক্ষা করা কি সম্ভব? আমি এর উত্তর খুঁজছি।

সশস্ত্র আততায়ীর আক্রমণ থেকে ছেলেটিকে আমি সেদিন কেন বাঁচাতে যাইনি, তার একটা স্পষ্ট উত্তর আমার জানা আছে। আমি নিরস্ত্র, আমি নিরীহ, আমি কোনও অস্ত্রই চালাতে জানিনে এবং আমি আমার প্রাণটাকে মূল্যবান মনে করি। অথবা করিনে, কিন্তু শরীরে ছুরির আঘাত বা ডাণ্ডার আঘাত যে যন্ত্রণার জন্ম দেয়, তার সম্পর্কেই আমার একটা আতঙ্ক আছে আছে, তাই আমার সাধ্যমত সেই যন্ত্রণা বা যন্ত্রণার কারণকে পাশ কাটিয়ে চলতে চাই। এই কারণেই আমি সেদিন তেতালা থেকে ছুটে নেমে যাইনি ছেলেটাকে বাঁচাতে। সত্যি বলতে কি এ পর্যন্ত আমি আমার কাজ সমর্থন করি, এ পর্যন্ত আমার কোনও গ্লানি নেই। কিন্তু তারপর? আততায়ীরা চলে যাবার পর ছুটে যাইনি কেন? ছেলেটি যখন রাস্তায় পড়ে অসহায়, নিতান্ত প্রয়োজনীয় রক্ত অতি মূল্যবান মুহূর্তগুলির সঙ্গে তার দেহ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, তখন? তখন যাইনি কেন আমার এই সময়কার কাজ আমার কাছে যেমন অস্পষ্ট, তেমনি অস্পষ্ট আমার তীব্র গ্লানিবোধের কারণ। অথচ কষ্ট পাচ্ছি, দারুণ দংশনেই জর্জরিত হচ্ছি, এটাও তো সত্যি। কেন? [পৃ. ২৯৭][৮৮]

উপন্যাসটিতে যেমন দেখানো হয়েছে কিছু মানুষের অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের চিত্র। যার জন্য সমাজের তরুণ সম্প্রদায় রাজনৈতিক দলের গুণ্ডাবাহিনীতে পরিণত হচ্ছে। আবার গল্পের কথক তার মৃত্যুর পর স্ত্রী যেন সমস্ত আর্থিক পাওনা-গণ্ডা ঠিকঠাকভাবে পেতে পারে তারজন্য আগে থেকে সচেতন করে দেওয়ার চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। এর পাশাপাশি দেখা যায় কিছু মানুষ কর্মক্ষেত্র থেকে শুরু করে রাজনৈতিক ক্ষেত্র পর্যন্ত কর্তা ব্যক্তিদের তাঁবেদারি করে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং ট্রেড ইউনিয়নের নেতাদের বাড়বাড়ন্ত অবস্থা। এছাড়া উপন্যাসটিতে দেখা যাচ্ছে মেয়েরাও পুরুষের সাথে সমান তালে মদ খেয়ে চলেছে এবং তারা বিবাহিত জীবন ও বিবাহ-পূর্ববর্তী জীবনের দুই পুরুষের সাথেই সমান তালে সম্পর্ক রেখে চলেছে। উপন্যাসটিতে কেয়াকে বলতে শোনা যায়—

স্ত্রী অন্য পুরুষের সঙ্গে, তা হোক না সে অতীতের বন্ধু বারে বসে মাতলামো করছে, এ দৃশ্য দেখে কোনও স্বামী, হোক না সে নিজেও মাতাল, অবিচলিত থাকতে পারে, বলুন? কিন্তু আমি তাতে ভয় পাইনে। শচী আসুক এখানে, দেখুক আমাকে, আমি তো তাই চাই শচী বিচলিত হয়ে উঠুক, আমি তো তাই চাই। এমনি একটা আকস্মিক দুর্বিপাকে প্রচণ্ড ঝাপটায় আমার ওপর শচীর ভিতর গড়ে ওঠা পাঁচিলটা ভেঙে যাক, গুঁড়িয়ে যাক, আমি চাই। আমি তাই চাই। হয় আমরা কাছে আসি, নয় আমরাও গুঁড়িয়ে যাই। [পৃ. ১৭৭][৮৯]

কেয়া আরো বলেছে—

লোক কত বদলে যায়! শচী যেমন বদলেছে। যেমন বদলাচ্ছে এই লোকটা, যে আমার পাশে বসে আছে। ওর চোখ-মুখের দিকে চেয়ে দেখুন আজ কী সাংঘাতিক ভাবান্তর ওর পরিণত বয়সের চোখে, ওর ব্যবহারজীর্ণ ঠোঁটে অপরিণত মনের কামনা ঝিলিক মেরে উঠছে। আজ এই প্রথম ওকে এই রূপে দেখা। ওর এই চাঞ্চল্য আমাকে আজ, অনেকদিন পর নাড়া দিচ্ছে, আমার ভাল লাগছে। সাড়া দিতে প্রবল একটা ইচ্ছে করছে। দয়া করে ভুরু কোঁচকাবেন না। আগে সবটা শুনুন। আগেই আমাকে পথভ্রষ্টা বা স্বৈরিণী ইত্যাদি জাতীয় কিছু ভেবে বসবেন না, আমি শচীকে ভালবাসি এবং আমি তার স্ত্রী এবং আমাদের বিবাহিত জীবনের জয়ন্তী দিবস পেরিয়ে গিয়েছে। ... অতএব বুঝতেই পারছেন, আমি আর নিতান্ত খুকিটি নেই। শরীরেও ভাঁটার টান শুরু হয়েছে। তাই—আচ্ছা, আপনাদের কি মনে হয় না, আমার আর শচীর এতদিনের সম্পর্কটা শুধুমত্র স্বামী এবং স্ত্রী নয়, প্রভু এবং সেবাদাসীর? প্রেম, আনুগত্য, পরিচর্যা—শুধু একতরফ নিবেদন? এবং আমরা অনায়াসে যা পাই, তার সম্পর্কে আমাদের কোনও বিশেষ কৌতূহল ব সচেতনতা থাকে না? যা আমাদের অর্জন করতে হয়, তার ব্যাপারেই শুধু আমরা আগ্রহী হয়ে উঠি? ঠিক বুঝতে পারিনে। একদিন শচীকে আমার সর্বস্ব সমর্পণ করে সুখে টই-টম্বুর হয়ে থাকতাম। শচীও। তারপর শচীর সুখ একদিন ফুরিয়ে গেল। অনেক সংগ্রাম করে শচী প্রতিষ্ঠা পেল। না, আদায় করে নিয়েছিল সে। ছিল কবি, এখন সে বেশ বড় একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের

বড় একজিকিউটিভ। তবু তার সুখ নেই। আমার অবিশ্যি কোনও প্রোমোশন হয়নি। আমি এখনও শচীর স্ত্রী, মিসেস বাগচি। আমাদের ভিতরে যে উষ্ণতা ছিল, তা ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে এল। দীর্ঘকাল পরে, আজ, এখন আবার সেই উষ্ণতা, সেই চাঞ্চল্য, সেই কেমন একটা অস্থির বোধ মনের ভিতর জেগে উঠছে। [পৃ. ২৭৮][৯০]

সমাজে জটিলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে, মানুষের সম্পর্কের মধ্যেও জটিলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই বিষয়ে উপন্যাসের কথক বলেছেন—

হায়, মানুষ, বিশেষত পুরুষ কতটা অসহায়! পুরুষের ভালবাসাকে স্ত্রীর কাছে বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রকাশ করার পন্থা।[৯১]

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে শহর ও মফস্বলের একান্নবর্তী পরিবারগুলো ধীরে ধীরে ভাঙতে শুরু করে। কারণ তৎকালীন সময়ে মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। তার সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ হল কথকের উক্তি—

আমার মাকে বা বোনেদের কিছুদিনের জন্য মেজদা কি বড়দি, কি অন্য সব বিবাহিত বোনেদের বাড়িতে যদি পাঠিয়ে দেওয়া যেত, তা হলেও ক'দিন এই বাড়িতেই শুধু আমি আর মিনু শুধু দু'জন দু'জনের সঙ্গ লাভ করতে পারতাম। কিন্তু যদিও অন্যেরা মায়ের ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করত এবং মিনুর হাতে মায়ের যত্ন তেমন হচ্ছে না, এ বিষয়ে প্রায় সবাই সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছিল, তবু মাকে কয়েক দিনের জন্যও কেউ অধিকতর শান্তির নীড়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দেখাত না। মাও কোথাও যেতে চাইত না। যদিও মেজো বউদি বা অন্যান্যদের সম্পর্কে মা অনেক সময় স্নেহবাচক নানাবিধ উক্তি করত কিন্তু তাদের কারও কাছে গিয়ে থাকবার কথা উঠলেই মায়ের উৎসাহ নিবে যেত।

কাজেই বুঝতে পারছেন, আমি আর মিনু ক'টা দিন একা থাকব, এই ন্যূনতম অভিলাষটাও কেন চরিতার্থ হয়নি। ব্যাপারটা পীড়াদায়ক এবং অসুখের উৎস। অথচ সাধারণ সাদামাটা ঘটনা। শত শত পরিবারে এই ধরনের বা অনুরূপ অচরিতার্থ অভিলাষজনিত পীড়ায় কত শত নর এবং নারী ভুগছেন বলেই আমার ধারণা।" [পৃ. ২৬৭][৯২]

তৎকালীন সময়ে কলকাতা শহর ও মফস্বলগুলিতে একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যাওয়ার আরেকটি বড়ো কারণ হল আর্থিক অনটন ও দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি।

আজকাল কলকাতা শহরে যেখানে দ্রব্যমূল্য সতত অস্থির সেখানে একমাত্র অর্থমন্ত্রী ছাড়া আর সকলের পক্ষেই সংসারের লগি ঠেলা রীতিমত স্নায়ুবিধ্বংসী ব্যাপার। [পৃ. ২৬৪][৯৩]

গৌরকিশোর ঘোষের 'উপন্যাস সংগ্রহ'-এর 'এক ধরনের বিপন্নতা' ও 'কমলা কেমন আছে' উপন্যাস দুটিতে আমরা দেখতে পাই সমাজে যৌন বিকৃতি বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এর ফলে বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্যে ভাঙন তৈরি হচ্ছে। আর সৃষ্টি হচ্ছে কিছু অবৈধ সম্পর্ক। বিকৃত যৌন মনস্কতার ক্ষেত্রে বয়স বা ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলো গৌণ ভূমিকা গ্রহণ করছে। 'এক ধরনের বিপন্নতা' উপন্যাসটির শুরতেই রুবিকে বলতে শোনা যায়—

যে মেয়ে বাবাকে ভালবাসে মা, সেই মেয়ে আদর করে তার বাবার সঙ্গে তুই-তোকারি করলে দোষ কী? [পৃ. ৩১১][৯৪]

এই ভালবাসা ধীরে ধীরে মনের মধ্যে এক ধরনের সমাজ বর্হিভূত বিকৃত সম্পর্কের ধরণা জন্ম হতে থাকে। যার এক সময় বহিঃপ্রকাশ হতে চায়। এর ফলে সমাজে জন্ম নেয় নানা ধরনের অবৈধ সম্পর্ক। স্বাধীনতা-উত্তর আমাদের সমাজের ভেতরে বিকৃত যৌনতার সম্পর্ক ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। সমাজের যৌনতা বিষয়ক গোপন তথ্যের উন্মোচন বাংলা কথাসাহিত্যে গৌরকিশোর ঘোষের আগে খুব একটা বেশি পরিলক্ষিত হয়নি। উপন্যাসটিতে রুবির এই প্রশ্নের উত্তর আমরা পেয়ে যাই উপন্যাসটির কাহিনি যত এগোতে থাকে। শীতলের মুখেই রুবি ও শীতলের সম্পর্কের কথা বলতে শোনা যায়। সে করবীকে বলে—

''পরশু রাতে করবী।' শীতলের স্বর খুব করুণ হয়ে এল। 'রুবি যখন আমার ঘরে এল। আমি অসহায় হয়ে পড়েছিলাম করবী। আর একেবারে উন্মাদ। আমাকে আর রুবিকে বাঁচাবার কোনও ক্ষমতাই তখন আমার ছিল না। বাঁচিয়ে দিলে তুমি।'

'আমি!'

'হাঁ করবী তুমি। তুমি যদি দরজায় এসে না দাঁড়াতে—'

শীতল দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলল। সে তখন ভয়ে কাঁপছিল।

'না শীতল, তুমি ঠিক বুঝতে পারোনি।'

করবীর ওই স্পষ্ট দৃঢ় গলার স্বরে শীতল মুখ তুলে চাইল।

'আমি সবটা দেখেছি বলেই বলছি। তোমাদের দেখে মনে হচ্ছিল তোমরা যেন হাবুডুবু খাচ্ছ। তোমরা যেন ডুবতে চলেছ, কিন্তু তোমাদের চেষ্টা ছিল বাঁচবার দিকে।'

'এটা কি সান্ত্বনা করবী?'

'না।'

'কিন্তু কিছুই বাঁচেনি করবী। রুবির আর আমার মধ্যে এতদিন ধরে যা কিছু আমরা তিল তিল করে গড়ে তুলেছিলাম তার সব কিছু ভরাডুবি হয়ে গেছে। আমি আর রুবি, মরা দুজনেই আজ জ্ঞানী হয়ে উঠেছি। রুবি আর কোনওদিন বাবা বলে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে না। রুবি যে আমার রুবি নয়, সে যে নারী, আমি তাও কোনওদিন ভুলতে পারব না।' [পৃ. ৪০৩][৯৫]

উপন্যাসটি পড়তে পড়তে জানতে পারা যায় যে শীতল রুবির নিজের পিতা নয়। করবী শীতলের সাথে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে আবদ্ধ। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে শীতল ও করবী ও আমি দু'জন নারীর সঙ্গেই ধীরে ধীরে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। বিশ শতকের আশির দশকে সমাজে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক আগাছার মতো বৃদ্ধি পেতে থাকে। করবীকে মনের দাহ থেকে বলতে শোনা যায়—

'দেরি করে ফেলেছি?'

'হ্যাঁ, বড্ড দেরি। শুধু তোমার নয় শীতল। আমারও কুড়ি বছর ধরে অনিল যে ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হয়ে গিয়েছে, তার জায়গায় ধাপে ধাপে তুমি এসে গেছ, এ আমি বুঝতে পারিনি। ভেবে এসেছি এ শুধু রুবিরই খেয়াল। আজ যখন বুঝলাম তখন আমার আর কিছুই নেই। সব আকাঙ্ক্ষা সব ইচ্ছে আমি টুটি টিপে মেরে ফেলেছি শীতল। কিচ্ছু নেই।' [পৃ. ৪১১][৯৬]

উপন্যাসটিতে প্রথম থেকেই আমরা দেখতে পাই যে, রুবিই শীতলের সঙ্গে তার সম্পর্ক পাকা করে নিয়েছে। শীতলই তার বাবা। লেখকের বর্ণনায় সকলের কাছে তা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে।

রুবি নিজেই শীতলের সঙ্গে তার সম্পর্ক পাকা করে নিয়েছে। বাবা। শীতল, রুবির বাবা। করবীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও রুবি তার গোঁ ছাড়েনি। আজও শীতল তার বাবা। শুধু কৌশল বদলেছে রুবি। তার মাকে আর প্রকাশ্যে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে না। তবে রেগে গেলে বা কোনও কারণে করবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে চাইলে তার রণধ্বনি হিসাবে রুবি শীতল হয়ে ওঠে। বিব্রত বোধ করে। বিরক্তিও প্রকাশ করে। [পৃ. ৩৬২][৯৭]

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকেই ঘরের মেয়ে বউরা বাইরে যেতে আরাম্ভ করে জীবিকা অর্জনের তাগিদে। গৌরকিশোর ঘোষের 'কমলা কেমন আছে' উপন্যাসটিতেও দেখা যায় কমলাকে জীবিকা অর্জনের জন্য বাইরে যেতে হয়। বিকাশ তার স্বামী। বিযেরদিন বাসর ঘর থেকেই পুলিশ বিকাশকে নিয়ে যায়। কারণ সে ছিল নকশাল আন্দোলনের একজন নেতা। দীর্ঘদিন পর সরকার তাকে জেল থেকে মুক্তি দিয়েছে। এখন সে পঙ্গু। সে নিজে থেকে আর হাঁটতে পারে না। জেলে থাকাকালীনই তার এই অবস্থা হয়েছে। সরকারি ডাক্তাররা বলেছেন সে আর সারবে না। বিকাশের সাথে কমলার বিয়ে হবার আগে অনিন্দ্যর সাথে তার একটা সম্পর্ক ছিল। তাদের এই সম্পর্কটাকে মেনে নেয়নি কমলার বাবা।

অনিন্দ্য, তার বাবার মতে, ছেলে ভালো। কিন্তু অনিন্দ্যের সঙ্গে তাদের জাতে মেলে না। তাই অনিন্দ্যকে সরে যেতে হল। আর কোনওদিন দেখা হয়নি অনিন্দ্যর সঙ্গে। বিকাশের সঙ্গে তাদের জাতে মিলেছিল। তাই বাবার জেদে বিকাশ তার স্বামী।" [পৃ. ৪২০][৯৮]

এক ঝড় জলের রাতে ট্রেনের মধ্যে একজন লোক তাকে ধর্ষণ করে, কমলা প্রতিবাদ করেও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। উপন্যাসটিতে লেখক ট্রেনের মধ্যে কমলার সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনার যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে করে লোকটির যৌন প্রবৃত্তির বিকৃত চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। লোকটা কমলাকে শাসানির ভঙ্গিতে ধমকের সুরে বলতে লাগল—

কোনও রকম বোকামি করে লাভ হবে না। চুপ করে শুয়ে থাকুন। লোকটার চোখ দুটো অস্বাভাবিকভাবে জ্বলছে। ... আপনাকেও কোনও দরকার হত না। এতক্ষণ ধরে একা একা সেই লড়াইটাই করছিলাম। কিন্তু পরালাম না। লোকটা কাত হয়ে ঝুঁকে পড়ে কমলাকে চুমু খাবার চেষ্টা করল। লোকটা খপ করে কমলার একটা হাত টেনে নিয়ে তার বুকে চেপে ধরল। দেখুন দেখুন, এখানে কী হচ্ছে। লোকটার বুক ধড়াস ধড়াস করে লাফিয়ে উঠছে, কমলা সেটা টের পেল।

এখন কমলা শুয়ে আছে। নিথর। আলুথালু। লোকটাকে ঠেকাতে পারেনি সে। প্রথম দিকে শরীরটা ভয়ে শিঁটিয়ে ছিল। এমনিভাবেই সে কিছুক্ষণ প্রতিরোধ করেছিল। যতক্ষণ পেরেছে কমলা, প্রতিরোধ করে গিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার উপোসী শরীরটা যখন তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল, লোকটার জবরদস্তিতে ধীরে ধীরে সাড়া দিতে লাগল তখন, এমন যে কখনও হতে পারে, এটা দেখে কমলা বিমূঢ় হয়ে গেল। সে চোখ বুজে শুয়ে শুয়েই টের পেল লোকটা তার আলুথালু জামা কাপড় ঠিকঠাক করে দিল, তার চুলেও একবার হাত বুলিয়ে দিল। [পৃ. ৪২৯][৯৯]

এই ঘটনার পর কমলার কাছে লোকটার যে স্বীকারোক্তি করেছে তা থেকে লোকটার মনের দহন এবং মনস্তাপ দুটোই ফুটে উঠেছে। লোকটি বলেছে—

এই ফাঁকা কামরায় বসে একনাগাড়ে পথ চলতে চলতে আপনার মনে হয়নি আমরা দুজন এই পৃথিবীতে একা? একেবারে একা। আমারও কেউ নেই, আপনারও কেউ নেই। দুটো নিঃসঙ্গ লোক দুটো অপরিচিত গ্রহ থেকে নেমে এসে এই ট্রেনে পাশাপাশি চলেছে। ওরা দুজন। একই বেনচিতে। কিন্তু কেউ কারও সঙ্গী নয়। আসলে আমি সঙ্গী পেতে চেয়েছিলাম। গায়ে গা ঠেকিয়ে আপনার শরীর থেকে কিছু উষ্ণতা শুষে নিতে চেয়েছিলাম। এতটা যে এগুব এটা ভাবিনি। [পৃ. ৪৩০][১০০]

লোকটি নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করেছে, ''অনেকদিন নিঃসঙ্গ থাকলে মানুষ কি এমনই হয়ে ওঠে? এমন ক্ষুধার্ত? এমন খ্যাপা?" [পৃ. ৪৩০][১০১]

এখানে লোকটার জৈব ক্ষুধার পাশাপাশি কমলার অনেকদিনের উপোসী দেহও শেষ পর্যন্ত সাড়া দিতে বাধ্য হয়েছিল। এই ঘটনা ঘটে যাবার অনেক দিন পড়ে কমলা জানতে পারে ঝড় জলের রাতে যে ব্যক্তি তাকে জোড় করে ধর্ষণ করেছিল, সে হচ্ছে নকশাল আন্দোলনের নেতা। চারু মজুমদারের হাতে গড়া শিষ্য। যে পুলিশের গুলিতে মারা গেছে। কমলা সুকুমারের সন্তানের মা হতে চলেছে। তখন তারা দুজনেই সন্তানটিকে বাঁচিয়ে রাখার কথা ভেবেছে। কমলা বলেছে, 'ও আমাদের বেঁচে থাকার অবলম্বন।' আমাদের বেঁচে থাকার মানে হচ্ছে ও। ওকে যদি আমরা বাঁচিয়ে রাখতে না পারি, তবে আমরাই বা বাঁচব কী করে?' [পৃ. ৪৯৭][১০২] কমলা আরো বলেছে, এই শিশুটির মধ্য দিয়েই সুকুমার তাদের মধ্যে বেঁচে থাকবে। কমলা ও বিকাশ তাদের জীবনের একটা শূন্যতা থেকে আরেকটা শূন্যতার দিক ঢুকতে যাচ্ছিল। আর সেখান থেকে তাদেরকে বের করে আনে সুকুমারের সন্তান। কমলা উপলব্ধি করেছিল দুজনের একাকিত্বময় জীবনে দুজনকেই সমানভাবে প্রয়োজন। কমলা তার উপলব্ধির কথা বিকাশকে বলতে শোনা যায়—

আমি তোমার যন্ত্রণা টের পাচ্ছিলাম বিকাশ। আমিও একঘেয়ে দিন কাটানোর ক্লান্তির মধ্যে ক্রমশ ডুবে যেতে বসেছিলাম বিকাশ। এমন সময় তুমি এলে। তুমি জানো না বিকাশ, তুমি আমাকে কী দিয়েছ। তুমি টাকার কথা তুলতে। তোমার জন্য আমার কিছু টাকা খরচ হয়েছে বলে তুমি একটা হীনম্মন্যতায় ভুগতে। কিন্তু তুমি কি জানো তুমি আমাকে যা দিয়েছ তা টাকা দিয়ে কিনতে পারা যায় না?

... তুমিই প্রথম লোক যে আমার ফাঁকা সময়গুলো ভরে রাখতে তোমার সঙ্গ দিয়ে, তোমার উপস্থিতি দিয়ে। তুমি স্রেফ এ বাড়িতে আছ, এই ঘটনা ঘটিয়ে। তোমার উপস্থিতিই আমাকে আমার অসহায় বোধটা থেকে ; একাকিত্বের যন্ত্রণা থেকে, তুমি যাকে খাস হওয়া বলো সেই খাস হয়ে যাওয়ার ভয় থেকে মুক্তি দিয়েছে। [পৃ. ৪৯৮][১০৩]

উপন্যাসের শেষে দেখা যায় কমলা ও বিকাশের একাকিত্বময় জীবনকে পূর্ণ করে তুলেছে সুকুমারের সন্তান। উপন্যাসটিতে কমলা ও বিকাশের মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন ও দ্বন্দ্বকে আমরা লক্ষ করলাম। কিন্তু উপন্যাসের সূচনায় ধর্ষণের যে বিবরণ লেখক দিয়েছেন, এর আগে এত সাবলীলভাবে আর কোনো লেখকের পক্ষে এর বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হয়নি। উপন্যাসটি পড়তে পড়তে আমাদের বার বার মনে হয়েছে যে, লেখক একদিকে নকশাল আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার ইতিহাসকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। অপরদিকে ক্ষুধার্ত বা হাংরি জেনারেশনের আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যৌনতা বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করেছিলেন।

গৌরকিশোর ঘোষের উপন্যাসগুলিতে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিকতা মানসিক টানাপোড়েন, দ্বন্দ্ব আমরা যেমন কমবেশি লক্ষ করেছি, ঠিক একই রকমভাবে লেখকের গল্পগুলির মধ্যেও আমরা সেই মনস্তাত্ত্বিকতাকে খোঁজার চেষ্টা করব। এ প্রসঙ্গে গল্পসমগ্র গ্রন্থের সূচনায় অলক রায় লেখকের গল্প রচনার সময়কাল ও প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন, তা এখনে প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছে—

গৌরকিশোরের গল্প রচনার সূচনাকাল বিশ শতকের চারের দশক। যুদ্ধ-মন্বন্তর-সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-দেশবিভাগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে উঠে এসেছে গল্পের বিষয়, দেশকালচিহ্নিত কিছু নরনারী আর গল্পকারের জীবনজিজ্ঞাসা। [গল্প সমগ্র, ভূমিকা অংশ][১০৪]

গৌরকিশোর ঘোষের লেখা অনেক গল্পই (এই কলকাতায়, ম্যানেজার, শিকার, সাগিনা মাহাতো) বাস্তব অভিজ্ঞতার ফসল। লেখকের প্রায় সব গল্পই কম-বেশি বাস্তব অভিজ্ঞতার ফসল। তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ তাঁর প্রথম বই 'এই কলকাতায়' গল্প গ্রন্থটির মধ্যে। গল্প গ্রন্থটিতে নামহীন দশটি কাহিনিতে বিন্যস্ত রয়েছে লেখকের কলকাতা দর্শনের অভিজ্ঞতা। প্রথমে ১৯৪৮-৪৯ সালে 'এই কলকাতায়' সত্যযুগে ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল। পরে গ্রন্থাকারে বের হয় ১৯৫২ সালে। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লেখক নিজেই বলেছেন—

এই কলকাতায়, রবিবারের 'সত্যযুগে' ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল ১৯৪৮-৪৯ সালে। বই হিসেবে বের করতে গিয়ে খোল-নলচে দুই-ই পালটাতে হয়েছে। বলতে গেলে থোলো হুঁকো থেকে গড়গড়া গড়েছি।[১০৫]

অর্থাৎ 'এই কলকাতায়' যে সমস্ত কাহিনিগুলি রয়েছে তা কিছুটা আত্মজৈবনিক, কিছুটা সেই সময়ের কলকাতার রেখাচিত্র, এ প্রসঙ্গে লেখকের নিজস্ব উক্তি বেশি করে প্রণিধানযোগ্য—

ভাঙা একটা টিনের সুটকেস সম্বল করে একদিন কলকাতায় এসেছিলুম। আর এই কলকাতা ছাড়লুম এক ভাঙা মনের তোরঙ্গ ঘাড়ে করে। হাওড়ার নতুন পুলের আদ্ধেকটা তখন তৈরি হয়েছে। পুরোনো পুলটার ওপর দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে গেলুম। নতুন পুলের অর্ধ সমাপ্ত গার্টারগুলো গঙ্গার উপর ঝুলে রয়েছে। আমার মনে হল গুগুলো অভ্যর্থনা আকুল কলকাতার প্রসারিত দুটি বাহু! সস্নেহে দুটি বিশাল বাহু বাড়িয়ে স্মিত হেসে কলকাতা যেন বলছে, আগচ্ছ, ইহ আগচ্ছ। এসো, ফিরে এসো। এসেছি, বারবার এসেছি এই কলকাতায় আনন্দ পেয়েছি, আঘাত খেয়েছি। বিপর্যস্ত পর্যুদস্ত হয়ে ফিরে ফিরে গেছি। তবু কলকাতার ডাক এড়াতে পারিনি। [গৌরকিশোর ঘোষ গল্প সমগ্র, ভূমিকা অংশ][১০৬]

গৌরকিশোর ঘোষ শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের সুখ-দুঃখ, মধ্যবিত্ত জীবনের দ্রুত অবক্ষয়, তার পাশাপাশি নানরকম কর্মকাণ্ড তাঁর গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, মানুষের সুখ-দুঃখ আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। আমরা দেখার চেষ্টা করব এসবের মধ্য দিয়ে মানুষের মূল্যবোধ কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে।

> সময়টা আবার এমন, শক্ত করে হাল ধরতে না পারলে ঘূর্ণির চক্করে বিনি পয়সার ঘোল খেয়ে নিতে হয়। যুদ্ধের শুরুর কথাই বলছি। তামাম দুনিয়ার মানুষ যেন আর মানুষ নেই। কোনও এক রূপকথার দৈত্যের ফুসমন্তরে দুটো লড়ুয়ে মুরগি বনে ও একে ঠোকরাতে শুরু করেছে। দূর বিদেশের লোক, কোনওদিন চর্মচাক্ষুস না করলেও আমাদের চেনা দরিয়ার কূলে কূলে বাচ খেলে বেড়াচ্ছে। চেম্বারলেন, চার্চিল, রুজভেল্ট, স্ট্যালিন, হিটলার, মুসোলিনি, তোজো অপরিচয়ের চেগারের বাইরে দাঁড়িয়ে আর গলা খাঁকারি দেয় না। সকল আগল ঠেলে পরিচয়ের অন্দরমহলে হুট করে প্রবেশ করে মাসি পিসি দেওর ভাশুরের মতোই। [এই কলকাতা, পৃ. ২০][১০৭]

কলকাতার চারিদিকে তখন খালি থমথমে ভাব। লেখক সেই কলকাতাকে তুলনা করেছেন, এক ষড়ৈশ্বর্যময়ী রূপসী গিন্নি। যেন সদ্য পতিবিয়োগ হয়েছে। অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মানুষের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সমাজের বুকে পরিবর্তনের এক কালো রেখা ছায়াপাত করতে থাকে। যা ক্রমশ ঘনীভূত হতে থাকে। অর্থের অভাবে, পেটের দায়ে যুদ্ধের বাজারে মানুষ যখন অন্নাভাবে মরছে, বস্ত্রাভাবে লজ্জা নিবারণ করতে পারছেনা তখন মাখন মার মতো ব্যবসায়ীরা গুদামে লুকিয়ে রেখে হাজার হাজার মন চাল এবং শত শত গাঁট কাপড়। এরফলে বিপিন স্যাকরা এবং শশীর মতো সাধারণ মানুষের ঘরের স্ত্রী, কন্যারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে বেশ্যাদের জীবনকে বেছে নিয়েছিল। 'ম্যানেজার' গল্পে তার চিত্র কিছুটা পাওয়া যায়। 'বিপিন স্যাকরার বউ বেরিয়ে গিয়ে বেশ্যা হয়ে গেল। যাক শহর ভরে উঠল মানুষের তীব্র ক্ষিধের দূষিত গন্ধে।' [পৃ. ১২৭][১০৮] আবার অন্যদিকে বেশ্যাবৃত্তিকেই ক্ষুধানিবৃত্তির একমাত্র পথ হিসেবে বেছে নিয়েছিল অনেকে। আর সেই পথে গর্ভস্থ সন্তানকে নামাতেও দ্বিধা করেনি অনেক মায়েরা। সে চিত্রও আমরা দেখতে পাই 'একটি প্রতিশোধের কাহিনী' গল্পাংশে—

> শশী অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল।
>
> তারপর অকস্মাৎ উত্তোজিতভাবে শুরু করল, ''কেন খুন করেছি জানেন? মাগী পুষ্পকেও নিজের পথে নামাতে যাচ্ছিল। বোজেনকে এনেছিল, ওর সঙ্গে পুষ্পর আজ বিয়ে দিয়ে সাবিত্তি ভাঙবে বলে। মনে মনে আঁচ করেছিল বহুদিন। কত বুঝিয়েছে, নিজে তো ডুবলি সারাজীবন। আবার মেয়েটাকে নরকে ডুবোবার চেষ্টা কেন? কিন্তু চোরা না শোনে ধম্মের কাহিনী। ওর কী জিদ চাপল, মেয়েকে দিয়ে ব্যবসা করাবেই। আরে আমি বাপ হয়ে যেটা বুঝি, তুই মা, তোর প্রাণে সেটা ধরে না। ও যখন হয়, তখন তো আমরা স্বোয়ামী আর ইস্তিরি হিসেবেই ছিলাম। তবে? বুঝলেন না, এ ওর সেই পোতিশোধ নেওয়া ছাড়া কিছুই না। ওকে বেবুশ্যি বানিয়েছিলাম, সেই রাগ। তারই শোধ নেওয়া আর কি? [পৃ. ১০১][১০৯]

কোনো দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ সেই দেশের মানুষের মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দিতে বাধ্য করে এবং মানুষকে ধীরে ধীরে পাষণ্ড করে তোলে, সেটাই দেখিয়েছেন লেখক তাঁর কিছু কিছু গল্পের মধ্য দিয়ে। সেই রকমই গল্প 'আগমনী'। গল্পটির 'নরা' চরিত্রের মধ্য দিয়ে সেই মনুষ্যত্বহীনতার ছবিই তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন লেখক—

> পাশের গ্রামে ঘর ছাইতে গিয়েছিল। ফিরতে বেলা গড়িয়ে পড়ল। কত্তাটা আজ রেগে টং হয়ে যাবে। যাক গে। আর এই হপ্তাটা। নরার শরীর মুক্তির সম্ভাবনায় চঞ্চল হয়ে কাঁপতে থাকে। আর এই কটা দিন। তারপর বিশ্বাসদের হাতে মুক্তিপণ গুঁজে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবে। নরা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল। আরে, মা কই? কোথায় গেল? ঘরের ভিতর উঁকি মেরে দেখল, মা কাঁথামুড়ি দিয়ে কাঁপছে। ক'দিন থেকে জ্বরে ভুগছে বুড়ি। তাই নিয়েই কাজকর্ম করে। বললে কথা শোনে না। চিকিৎসা করাতে বললে রাজি হয় না। বেশি বলতেও সাহস

পায় না নরা। শেষ পর্যন্ত যদি ডাক্তার বদ্যি ডাকতে হয়! যদি টাকা খরচা হয়! সর্বনাশ! একটা টাকার থেকে একটা পয়সা খসবে সে কথা ভাবতেও নরা পাগল হয়ে যায়, মনে মনে বলে এমন শক্ত ব্যাধি কিছুই হয়নি মার, যার জন্যে ডাক্তার বদ্যি ডাকতে হবে। মা সে কথা বোঝে। বলে, ''ভাবিস নে বাপ, ভাল হয়ে যাবানে। পুরনো তেঁতুল একটু যুগাড় করিস তো। তা খালিই জ্বর ছাড়ে যাবেনে।'' নরা আশ্বস্ত হয়ে কাজে যায়। কিন্তু পুরনো তেঁতুলটুকুও আর যোগাড় হয়ে ওঠে না। অনেক রাত্রে পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়লে নরা টাকার হাঁড়িটা টেনে নামায়। আর একটা একটা করে গোনে। মা খকখক করে কাশে। ঘুমতে পারে না বুড়ি। খুব কাশে। হাঁফায়। নরা সেদিকে একবার তাকায়। মায়ের কষ্ট দেখে কষ্ট পায়। কিন্তু মনের অজ্ঞাতস্বরেই হাঁড়িটা লুকিয়ে ফেলতে যায়। যেন মায়ের এই অসুখ ষড়যন্ত্র করে ওর টাকাগুলে ছিনিয়ে নিতে এসেছে। কিন্তু না, এর থেকে একটি পয়সা সে কাউকে দিতে পারবে না ; সন্তর্পণে হাঁড়িটা রেখে মায়ের কাছে ফিরে আসে। বুক ডলে দেয়। গা হাত-পা টিপে দেয়। প্রাণপণে সেবা করে তার। গতর দিয়ে যতটুকু পারে তার কসুর করে না নরা। একদিকে মায়ের অসুখ কমবার লক্ষণ নেই। কাজে বের হবার সময় মার কাছে এগিয়ে যায়।

....

... কাল সকালে বুড়ো বিশ্বাসের হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে চাকরিতে ইস্তাফা দিয়ে মুক্তি। মুক্তি পাবে সে। যোগাড় হয়েছে সব টাকা। রাখালি আর নয়, এবার থেকে হালুটি। হাল ধরবে, বিদে চালাবে, মই দেবে মাঠে। নরা বাড়ি ফিরে দেখে বুড়ি ঘরের কোণে ঘাড় গুঁজে বসে আছে। ঘরের খুঁটি কাটা। হাত-দা, আর খুচরো পয়সা কতগুলো গড়াগড়ি যাচ্ছে

... গায়ে হাত ঠোকাতেই বুড়ি গড়িয়ে পড়ে গেল খুচরো পয়সাগুলোর উপর। কচকচ শব্দ করে উঠল রেজগিগুলো। বুড়ির দেহ ঠাণ্ডা। হাত-পা সব শক্ত কাঠ হয়ে গেছে। নরা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। [পৃ. ১১৩][১১০]

নরার জীবনের মধ্যাহ্নে স্ত্রী হরিদাসী তার গুরুপুত্রের সঙ্গে পালিয়ে যায়। তার মনের মধ্যে ঘৃণার মেঘ উড়ে উড়ে আসে, ধীরে ধীরে সমস্ত মনে বিতৃষ্ণা জমাট বাঁধে। ঘৃণা তীব্রতর হয় এতদিন নরার অন্তর চক্ষুকে ঢেকে রেখেছিল কামিনী আর কাঞ্চন। সে এতদিনে মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। সে উপলব্ধি করেছে—

শ্মশানে এলেই শান্তি আসে নরোত্তমের। শ্মশান মানে মৃত্যু। আর মৃতের মতো শান্ত কে? মন চঞ্চল হলে, চিত্ত বিক্ষিপ্ত হলেই নরোত্তম শ্মশানে এসে বসে। মনকে শাসন করে শ্মশানের স্তব্ধতা দিয়ে। এই নীরেট নীরবতায় বেক মন স্ববশে আসে। [পৃ. ১১৯][১১১]

গ্রামের মানুষগুলো যেমন ধীরে ধীরে পাষণ্ড হয়ে উঠছিল, ঠিক একইরকমভাবে সারা শহর ভরে উঠল মানুষের তীব্র ক্ষিধের দূষিত গন্ধে। গ্রাম থেকে ধুঁকতে ধুঁকতে যরা শহরে এসেছিল, তারা ছটফট করে মরতে লাগল ক্ষিধের জ্বালায়। সেই মাসে শহরের মানুষের মধ্যেও দেখা দিতে লাগল মনুষত্বহীনতা। দেশভাগের সময় যারা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসেছিল ভারতে নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় তারা ভেবেছিল ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় আছে, মানসম্ভ্রমের মূল্য আছে। কারণ এটি হল, সীতার দেশ, সাবিত্রীর দেশ। এখানে সতীধর্ম অটুট রাখবার কাণ্ডারী আছে। তাই ওপার বাংলা থেকে মানুষ জীবন তুচ্ছ করে ছুটে এসেছিল পশ্চিমবঙ্গে। তারা স্থান নিয়েছিল উদ্বাস্তু শিবিরে। কিন্তু সেখানে নিশ্চিন্তে কেউই থাকতে পারেনি। উদ্বাস্তু শিবিরে মেয়েরা রূপ আর যৌবন নিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারেনি। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে বাধ্য হয়েছে তারা। নিরুপায় হয়ে নানাজনকে দেহ দিতে বাধ্য হয়েছে। এই কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় 'জবানবন্দী' গল্পের মেনকার মুখে।

দেহটার জন্য আর ভাবনার কিছু ছিল না। অভিজ্ঞতায় জানলাম, সে ভাবনা নামগোত্রহীন উদ্বাস্তু-মেয়েদের কাছে অনর্থক শুচিবাই ছাড়া আর কিছু নয়। তবু উদ্বাস্তু শিবির ছেড়ে পালিয়েছি। কারণ টিকতে পারিনি। মৃত অথবা অথর্বা ছাড়া কেউ সেখানে থাকতে পারে না।'' [পৃ. ১৫০][১১২]

লেখক যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি এবং যুদ্ধের পরবর্তী পরিস্থিতিতে সমজের গভীরে লুকিয়ে থাকা মনস্তত্ত্বকে যেমন দেখানোর চেষ্টা করেছেন, পাশপাশি মানুষের মনের অন্তঃস্থলে লুকিয়ে থাকা মনস্তত্ত্বকেও দেখিয়েছেন লেখক। 'অন্ধকূপ' গল্পে 'গৌরীর' কথার মধ্যে সেই কথাই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে।

> গৌরীর মনে পড়ল মানুষ এককালে গুহাবসী ছিল। দেহে মনে অন্ধকার নিয়ে ঘুরে বেড়াত। শুধু ভয়, শুধু সংশয় আর আতঙ্ক। এই ছিল সে-সব মানুষের প্রধানতম অনুভূতি। দৈবাৎ কাউকে দেখত যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে হত্যা করত তাকে।
>
> তারপর সে যুগকে অনেক পিছনে ফেলে গৌরীরা চলে এসেছে আজকের জগতে, অনেক আলোয় স্নান করে অনেক সূর্যের প্রসাদ পেয়ে।
>
> কিন্তু কই, সেই আদিম অন্ধকূপকে গৌরী তো আলোকিত করতে পারেনি। সে যে এখনও তার মধ্যে বাস করছে।
>
> ... নিজের মনের দিকে চাইল গৌরী। কী গভীর খাদ, আর কত জমাট অন্ধকার! ভয় আর সংশয়, সন্দেহ আর আতঙ্ক।। এই দিয়ে ঠাসা। [পৃ. ১৬৭][১১৩]

অর্থাৎ শুধুমাত্র গৌরীর মনের মধ্যে জমাট বাঁধা অন্ধকারই বাসা বেধে নেই। গৌরীর মতো সমস্ত মানুষের মনের মধ্যে রয়েছে জমাট অন্ধকার, ভয় আর সংশয়, সন্দেহ আর আতঙ্ক। আর সেই ভয়, সংশয়, সন্দেহ আর আতঙ্ক নিয়েই মানুষ একে-অপরের সঙ্গে সম্পর্কের গ্রন্থি জুড়ে চলেছে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। হয়তো সময় এসেছে সেই ভুলের গ্রন্থি উন্মোচনের। তাই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই দেখা যাচ্ছে সেই গ্রন্থি উন্মোচনের চেষ্টা। আর সেই চিত্রই ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক 'আমরা যেখানে' গল্পের দ্বিতীয় পর্ব ঞ্জ 'তলিয়ে যাবার আগে' রচনাংশটির মধ্যে দিয়ে। রচনাংশের লিলির কথার মধ্যে তা স্পষ্ট ভাবেই ফুটে উঠেছে।

> যে ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির উপর আমরা নিশ্চিন্ত মনে একটা অসার সংসার পেতে তার চারপাশ সুরক্ষিত করেই ভেবেছিলাম আমরা নিরাপদ এবং তাই ভেবেই আত্মতৃপ্তিতে ডুবেছিলাম, ভাবেনি একদিন সেই আগ্নেয়গিরিটাই জেগে উঠে এক লাথিতে সব চুরমার করে দেবে। ... আমি তুমি স্ত্রী-স্বামী এক সামান্য আঁচড়ই আমরা প্রমাণ করেছিলাম আমরা কেউ কারোর না। আমি আমার তুমি তোমার। এক ঝটকায় প্রমাণ হয়ে গেল, আমাদের পরম পবিত্র দাম্পত্য বন্ধন কত পলকা। সেই অগ্নিসাক্ষী বেদমন্ত্র, সেইসব আনুষ্ঠানিক অঙ্গীকারের ভড়ং, ঠিক যেন আমাদের এই ফ্ল্যাটটার আড়ম্বরের মতোই অর্থহীন। এত তো আসবাব, এইসব সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে এত তো পরিশ্রম, একটু এদিক ওদিক হলে কিংবা একটা জিনিস খোয়া গেলে আমরা কত না আপসেট তো হই, কিন্তু ফস করে আগুন লাগুক, তক্ষুনি এসবের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এক লাফে আমি তুমি রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াব। এই সব আসবাবের প্রতি মমতাবশত ওদের সঙ্গে পুড়ে মরতে কিছুতেই রাজি হব না। নয় কি অসিত? আমরাও তেমনই আমাদের প্রত্যাখ্যান করেছি। তুমি আমাকে, আমি তোমাকে। [পৃ. ৩১১][১১৪]

অর্থাৎ বিংশ শতকের আশি ও নব্বইয়ের দশকে সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসা-বিশ্বসের জয়গায় ভয়, সন্দেহ, সংশয়, আতঙ্ক বেশি করে বাসা বাধতে আরম্ভ করেছিল। যার ফল হয়েছিল সম্পর্কগুলির মধ্যে ভাঙন। বিশেষ করে মধ্যবত্তি চরিত্রগুলি নীজের নিজের ভালো থকার কথা বেশি করে চিন্তা করে, ফলে একে অপরের কথা ভাবতে ভুলে যায়। তারা ধীরে ধীরে মনুষ্যত্বহীন, বিবেকহীন মানুষে পরিণত হতে থাকে। একে অপরের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে আস্তে আস্তে সরে আসতে থাকে। তারা নিজের নিজের সর্বোচ্চ সুখের কথা চিন্তা করতে থাকে। যা আমরা 'তলিয়ে যাবার আগে' রচনাংশের কাহিনির মধ্যে দেখতে পাই। কাহিনিটিতে লিলি তার স্বামী অসিতকে বলে—

> এই হচ্ছে আমাদের মধ্যবিত্ত চরিত্র। এইভাবেই আমরা আত্মীয়স্বজন, বন্ধু, পাড়া-প্রতিবেশী, সকলের চোখে ধুলো দি। কাউকেই বুঝতে দিই না, আমরা কী। এই কপট ভূমিকায় অষ্টপ্রহর অভিনয় করতে করতে শেষ পর্যন্ত নিজেই বুঝতে পারিনে, আমার কোন আমিটা আসল আর কোনটাই বা নকল। তাই আমরা কোনও

সিদ্ধান্ত নিতে পারিনে। যে সময় যেটা করার তা করতে পারিনে। আর তাই, আমাদের এই দুর্বলতা চাপা দেবার জন্য আমরা শুধু বড় বড় কথা ফেরি করে বেড়াই। সেকেণ্ড হ্যাণ্ড সব কথা। আমাদের সব কিছুই সেকেণ্ড হ্যাণ্ড অসিত। শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, বোধ সব সব। আমাদের পুঁজি এই। তাই আমরা সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয় পাই। জীবনের মুখোমুখি হতে ভয় পাই। ভয় ভয়! সর্বদাই কী হারাই কী হারাই ভয়। অথচ কী যে আমার আছে, কী খোয়া যাবে, কী খোয়া গেলে জীবনটা ফাঁকা হয়ে উঠবে, তাও জানিনে। [পৃ. ৩১৪][১১৫]

অর্থাৎ 'তলিয়ে যাবার আগে' রচনাংশটিতে আমরা দেখতে পাই যে অসিত তার স্ত্রী ললিতাকে তিনজন গুণ্ডা অপহরণকারীর হাতে তুলে দিয়ে নিজে বাড়ি ফিরে এসেছিল। তারপর থেকে একদিনও স্ত্রীকে খোঁজার চেষ্টা করেনি অসিত। লিলি ফিরে আসার পর তার মুখোমুখি হয়ে অসিত বলে—

বিশ্বাস কর লিলি, তোমার সেফটির কথা ভেবেই আমি কোনও রকম র‍্যাশ অ্যাকশন নিতে পারিনি। দিনরাত চিন্তা করেছি, বাড়িতে অফিসে নানা কাজের মধ্যেও ভাবতে চেষ্টা করেছি, কি চায় ওরা? কেন ওরা তোমাকে ধরে নিয়ে গেল? ওদের মোটিভ কী?

—ভেবে কি বের করলে অসিত? ওদের মোটিভের কোনও হদিশ পেলে?

অসিত হতাশভাবে মাথা নাড়ল, না।

বলল, প্রথমে ভেবেছিলাম, ওরা বুঝি মুক্তিপণ দাবি করবে। রোজ আশা করে থাকতাম, হয়তো একটা চিঠি আসবে, তুমি একে পেরিম্যানস মার্কা কাহিনী হিসেবে ব্যঙ্গ করতে চাও করতে পার, সত্যি বলতে কি এই মুহূর্তে আমার কছেও ব্যাপারটা যথেষ্ট হাস্যকর বা ছেলেমানুষি বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু তখন আমি যা করেছি তোমাকে অনেস্টলি তাই বলছি। [পৃ. ৩১০][১১৬]

অসিত তার নিজের মনের সংশয়, ভয়, আতঙ্ককে লিলির কাছে চাপা দেওয়ার জন্য এবং অভিযোগকারী লিলিকে কি বলে বোঝবে যে, সে নির্দোষ। সে চেষ্টা করেছিল তাকে উদ্ধার করতে। কিন্তু সরকার এবং পুলিশের সহযোগিতার অভাবে সে তাকে তিনজন অপহরণকারীর হাত থেকে উদ্ধার করতে পারেনি। লেখক অসিতের এই মানসিক অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন—

লিলি যদি অভিযোগ করে, আমাকে গুণ্ডারা ছিনিয়ে নিল, তুমি দেখেও পালালে, আমাকে ওরা রেপ করল, তুমি আমার মর্যাদা রক্ষা করতে ব্যর্থ হলে, অথচ তুমি যখন আমাকে বিয়ে কর, তুমি সর্বতোভাবে আমাকে রক্ষা করবে, এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে এবং তুমি তা ভঙ্গ করেছ। এ অভিযোগ করতে পারে লিলি, অভিযোগ সে করছে। অসিত অস্থির হয়ে উঠল।

... কিন্তু কী বলবে সে? সে কি এই কথা বলবে, সরকার তোমাকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে লিলি, পুলিশ তার কর্তব্য করছে না। আধুনিক সমাজে ইন্ডিভিজুয়াল হিরোইজম অর্থহীন হয়ে পড়েছে লিলি, তাই গুণ্ডারা তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল ; কিন্তু আমি তাদের হুকুম মেনে এয়ার কন্ডিশনড ঘরে বসে সেফলি আশ্রয় নিলাম, মনের অশেষ যন্ত্রণার উপশমের জন্য রাত জেগে বসে বসে হুইস্কির বোতল শেষ করলাম লিলি, আর গুণ্ডারা তোমায় তখন ছিঁড়ে খাচ্ছিল। আর আমি দিনের বেলা রোজ যেমন অফিসে যাই, তেমনি গিয়ে অফিস করলাম, জানিনে তখন তোমার বরাতে আর কী কী লাঞ্ছনা জুটছিল। তুমি হিংস্র পশুদের দাঁতে নখে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিলে লিলি, আর আমি সন্তর্পণে সেফটি রেজার চালিয়ে স্মাগল করা আফটার শেভ লোশন লাগিয়ে আমার মসৃণ গাল দুটো বীজাণুমুক্ত করে রাখছিলাম। [পৃ. ৩২০][১১৭]

লেখক কাহিনীটির মধ্যে নিজের গা বাঁচানো মধ্যবিত্তের ছবি অসিত চরিত্রটির মধ্য দিয়ে যেমন এঁকেছেন, ঠিক তার পাশাপাশি তৎকালীন সময়ের কিছু মধ্যবিত্ত পরিবারের যুব সম্প্রদায়ের সমাজ-বিরোধী হয়ে ওঠার চিত্রও আমরা দেখতে পাই অপহরণকারী তিনজন যুবকের মধ্যে। এদের প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে লিলি বলেছে—

> এরা কেউ ব্যর্থ, কেউ বঞ্চিত। ওদের জীবনের কোনও আশা-আকাঙ্ক্ষাই পূরণ হয়নি, স্বাভাবিক শখ সাধ কিছুই মেটেনি, অতএব তারা যা খুশি তা করতে পারে। সব রকম দুষ্কর্মের লাইসেন্স তবে তো সর্বস্তরে সমাজ বিরোধীরাও এই যুক্তিবলে পেয়ে যেতে পারে। কেননা, এ জগতে কে এমন আছে যে, কোনও না কোনওভাবে বঞ্চিত হয়নি। কখনও ব্যর্থ হয়নি বা যার সব আশা সব আকাঙ্ক্ষা সব শখ সাধ আহ্লাদ মিটে গেছে? [পৃ. ৩৩১][১১৮]

অসিতের এই প্রশ্নের উত্তরে লিলি তাকে জানায় যে—

> যে তিনজন তাকে অপহরণ করেছিল তারা সবাই এই মধ্যবিত্ত পরিবারেরই ছেলে এবং স্বাভাবিক জীবন এদের প্রত্যাখ্যান করছে। পরিবারের আকর্ষণ এদের কাছে শিথিল হয়ে এসেছে, সমাজ বলে কোনও ধারণা এদের মনে গড়ে ওঠেনি। এরা ব্যর্থ, তাই বাপ-মায়ের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা বোধ করে। এই লজ্জা আরও অসহনীয় হয়ে ওঠে অসিত, যখন এদের নিতান্ত নিরুপায় হয়ে ক্ষিধের জ্বালায় মানমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে চোরের মতো বাড়িতে ফিরে গিয়ে ভাতের থালা টেনে নিয়ে বসতে হয়, বসতে এরা বাধ্য হয়। এই কয়েকটা মিনিট হচ্ছে ওদের জীবনের সব থেকে যন্ত্রণাদায়ক মুহূর্ত। সেই অন্নের প্রতিটি গ্রাস ওদের স্মরণ করিয়ে দেয় ওরা অপদার্থ, ওরা অনধিকার প্রবেশ করেছে, এই ভাতের থালায় ওদের কোনও অধিকার নেই, এ ভিক্ষে। ওরা অস্থির হয়ে ওঠে। ওরা প্রচণ্ডভাবে ফেটে পড়তে চায় পড়েও যেকোনও অজুহাতে। মনে সারাক্ষণ নিরুপায় অন্ধ ক্রোধ ধিক-ধিক জ্বলতে থাকে এবং সেই আগুনের তাপের পরিমাপ দু'হাজার ফারেনহাইট-এর কিছু কম নয়। এই উত্তাপে ন্যয়নীতিবোধ হিতাহিত জ্ঞান গলে যবে, এ আর বিচিত্র কি, অসিত?" [পৃ. ৩৩২][১১৯]

লিলি লক্ষ করেছে তদের কঠিন, হিংস্র, খুনি চোখগুলোর মধ্যে অতলস্পর্শী ব্যর্থতার তীব্র জ্বালা লুকিয়ে থাকতে। এরা কেউই রেপিস্ট বা গুণ্ডা নয়। নারী হরণও এদের প্রথম, এতদিন এরা গুণ্ডমিতে হাত পাকিয়েছে, এবার তারা একটা নতুন লাইন ধরতে এসেছে। এইভাবে হাত পাকাতে পাকাতেই একদিন তারা পাকা রেপিস্ট হয়ে দাঁড়াবে। এরা এরা যখন রাস্তায় বের হবে তখনই এদের চোখ মুখে ফুটে উঠবে লোভ-লালসার কঠিন নৃশংস ছায়া। কৈশোর উত্তীর্ণ তিনজন অপহরণকারী যুবক মিলে লিলিকে রেপ করেছে। তখন সে বুঝতে পেরেছে এর আগে এরা কোনো নারী দেহ মন্থন করেনি। লিলিকে পেয়ে তাদের চোখের তারায়, মুখের রেখায় হিংস্রতা ফুটে উঠেছে। লালসা উপচে পড়েছে। কারণ তাদের জীবনে রয়েছে শুধুমাত্র বঞ্চনা। বঞ্চনা ছাড়াও যে একটা পরিতৃপ্তিরও একটা জগৎ আছে এবং সে জগতে প্রবেশের চাবিকাঠি যে হিংস্রতায় নেই, হিংসায় নেই, লোভে নেই, লালসায় নেই, সেটা তারা এতদিন পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারেনি। লিলির সান্নিধ্যে এসেই তারা সেটা উপলব্ধি করেছিল এবং তারা বুঝতে শিখেছিল নারীদেহ জবরদস্তি ভাবে মন্থন করলে তা থেকে তিক্ত হলাহল ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। লিলি তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছে—

> নারী দেহ জবরদস্তিভাবে মন্থন করলে তা থেকে তিক্ত হলাহল ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। অমৃতের আস্বাদ পেতে হলে নারীর সম্মতির দরকার লাগে। এবং সে সম্মতি ছুরি দেখিয়ে, নিপীড়ন করে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় স্নেহে প্রেমে অনুরাগে। আর স্নেহ প্রেম অনুরাগ প্রবৃত্তিকে রাশ আগলা করে লেলিয়ে দিয়ে পাওয়া যায় না, থাবা মেরেও ছিনিয়ে আনা যায় না, তাকে সৃষ্টি করতে হয় মনে, কল্পনায়, ধ্যানে, এখানে মস্তানি খাটে না, কোনও রকম চালাকি না। [পৃ. ৩৩৫][১২০]

লিলি ছেলেগুলোর মধ্যে আত্মমর্যাদবোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। তার কাছে মনে হয়েছিল দেহের শুচিতা কিছু না, আত্মমর্যাদই মানুষের সব থেকে বড়ো সম্পদ।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে কলকাতা ও কলকতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে রাজনৈতিক অস্থিরতা সবসময়ই বিরাজ করত। আর এই রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে মানুষের মনে নানা ধরনের আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল। সেই আতঙ্ক থেকে মানুষ মনের মধ্যে কিছু অমূলক ধারণাকে পোষণ করছিল। যেমন—'হঠাৎ জোয়ার' গল্পে বিজলীর মনেও অমূলক কিছু ভয় বাসা বেঁধেছিল। গল্পে বিজলীকে বলতে শোনা যায়—

> কোনাগলিতে আমার বেজায় ভয়। একবার ঢুকলে আর বেরুতে পারব না। শুধুই ঘুরপাক খেতে থাকব। হাঁটতে হাঁটতে একদিন শক্তি ফুরিয়ে যাবে তাপের সেই অন্ধকার পাঁচিলের গোড়ায় মুখ থুবড়ে পড়ব। আর উঠতে পারব না। কোনও আপন লোক থাকবে না। কেউ জানতে পারবে না কোথায় আমার বেওয়ারিশ শরীরটা পড়ে আছে। তারপর একদিন বড় বড় ধারালো দাঁত বের করে ইঁদুরের পাল এগিয়ে আসবে। মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে শুধু সাদা কঙ্কালটা ফেলে রেখে চলে যাবে। [পৃ. ৩৫০][১২১]

গৌরকিশোর ঘোষের লেখক জীবনের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হল পাশ্চাত্য-সাহিত্যিকের প্রভাব। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হলেন Franz Kafka. তাঁর মেটামরফসিস গল্পের প্রভাব রয়েছে লেখকের 'আরশোলা' গল্পটিতে। আমদের পূর্বোক্ত আলোচিত 'হঠাৎ জোয়ার' গল্পের প্রধান চরিত্র বিজলীর মনের ভাবনার মধ্যেও 'কথাকার' 'মেটামরফসিসে'র প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয়। কারণ বিজলী যখন মনে করে যে, তার বেওয়ারিশ শরীরটা কোনাগলিতে পড়ে থাকবে, আপন লোক কেউ জানতেও পারবে না। তারপর একদিন বড়ো বড়ো ধারালো দাঁত বের করে ইঁদুরের পাল এসে মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে শুধু সাদা কঙ্কালটা ফেলে রেখে চলে যাবে। আবার অন্যদিকে 'আরশোলা' গল্পের কথক বিলেতি মদের নেশায় নেশাগ্রস্ত হয়ে তার মনে হয়েছে 'পঁয়তাল্লিশ বছরের গদগদে দেহটার চেয়ে আরশোলার বডি ঢের বেশি যানযানে। তাছাড়া মানুষের থেকে আরশোলা হওয়ার একটা মস্ত সুবিধে আছে। তার মনে হয়েছে আরশোলার জগতে সমস্ত কিছুই মানুষের জগতের থেকে অনেক শৃঙ্খলাবদ্ধ। তাই তার ভগবানের কাছে আর্তি, তাকে যেন আরশোলা করে দেওয়া হয়। মানুষ জাতের প্রতি গল্পের কথকের মন্তব্য—

> অন্যের পিছনে কাঠি দিয়ে আমোদ করা, এ কাজ শালা একমাত্র মানুষের জাতের পক্ষেই সম্ভব।" [পৃ. ৩৫৯][১২২]

আবার সে তার শুঁড় দুটো বিড়বিড় করতে করতেও ভাবতে লাগল—

> যুক্তিশীলতার আরেকটি অবদান হল মানুষের জটিলতম সামাজিক সংগঠনের গ্যাঁড়াকল। এই জটিল যান্ত্রিকতার লেবেলের নামই আবার সভ্যতা। সভ্যতা! কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন। এমন চূড়ান্ত অসভ্যতা কেউ কখনও দেখেছে? নাও, শালা—এখন নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে মরো। অস্তিত্বের স্বাভাবিক পটভূমি থেকে অনেক রংবাজি করে তো নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিস। জটিলতার এই বিরাট মোড় এখন হাতের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। একাকিত্বের অনাদ্যন্ত অসহায় শূন্যতায় এখন খাও শালা-ত্রিশঙ্কুর মতো ঘুরপাক। সুখ মেটাতে রংবাজি করেছ, এখন জ্বালা মেটাতে জন্মভর ফুঁ দিতে থাক।" [পৃ. ৩৬১][১২৩]

অর্থাৎ মানুষের জীবনে সংস্কারই সম্বল কিন্তু আরশোলার জীবনে কোনো সংস্কারের বালাই নেই। আর ভাবের ঘরে চুরি করতে মানুষের চেয়ে ওস্তাদ তো আর কেউ নেই।' মানুষই ব্যাপক ধ্বংসের আণবিক হাতিয়ার তৈরি করেছে। সেই হাতিয়ার দিয়ে নিজেরাই নিজেদেরকে নির্মূল করার জন্য উদ্যত হয়েছে। এতে আরশোলাদের মতো জীবগোষ্ঠীর কিছুই আসে যায় না। তাই গল্পের কথককে বলতে শোনা যায়—

> অন্ধকারই আদি। অন্ধকারই জননী। আদি মাতা। আমরাও অন্ধকারের অন্তরঙ্গ। অতিকায় প্রাচীন কোটি কোটি বছর ধরে আমরা আছি। আমরা থাকব। ভূমিকম্প, প্লাবন, প্রলয়, বিবর্তন আমাদের বদলাতে পারেনি। যেমন এসেছিলাম, তেমনি আছি তফাৎটা দেখ। আমাদের আবির্ভাবের পরে কত কোটি কোটি মক্কেল এল।

কারও শুঁড়ে জোর, কারও দাঁতে ধার, কারও পায়ে ভার। অনেক দিন কতক কত ফুটুনি মারলে। কত রোয়াবি, আবার স্বাভাবিক নিয়মে ফৌতও হল। মাটির ভাঁজে ভাঁজে এখন ইতিহাসের মশলা হয়ে তারা পড়ে আছে। তাদের মত্ততা ছিল কিন্তু মানুষের মতো অহং ছিল না। মানুষের মতো 'আমি ছাড়া এ দুনিয়া আর কাউকে রাখব না", এমন সর্বনাশা প্রতিজ্ঞা নিয়ে অন্য কাউকে উদয় হতে দেখিনি। কী ক্রূর, কী খল, কী নিষ্ঠুর, কী উন্মাদ ওরা! হত্যার পিপাসা ওদের কখনও মেটে না। মানুষ ছাড়া আমরা আর সবাই এক বিরাট বিশ্বে মিলেমিশে ছিলাম। নিপাট সহাবস্থান। সৃষ্টির ফুটোটি কেউ কখনও নষ্ট করিনি। আমরা শত্রুর কাছ থেকে দূরে থেকেছি, অসতর্ক হলে জীবন দিয়েছি, ইকন্তু পাইকারি হত্যায় মেতে উঠিনি কেউ। কিন্তু দেখ, মানুষকে দেখ। ওরা যা চায় না, ওদের যা মোনাসিব নয় তাকে ঝাড়ে বংশে নির্মূল করে ছাড়ে। গাছপালা তৃণ গুল্ম কীটপতঙ্গ মাছ পাখি পশু—মানুষের হাতে কেউ রেহাই পায়নি। অন্যে পরে কা কথা, অনাবশ্যক মনে করে ওরা গায়ের লোম পর্যন্ত ছেঁটে ফেলে। ওরা আলোর উপাসক। আলো মাতৃদ্রোহী। অন্ধকার থেকে আলোর জন্ম। সেই আলো অন্ধকারকে ফালাফালা করে চিরবার জন্য সতত ছুরি শানাচ্ছে। হত্যার এই সহজাত প্রবৃত্তি মানুষ শয়তান আলোর কাছ থেকে ধার করেছে। সাবধান, আলোর ফাঁদে পা দিও না। মরবে। আলো হচ্ছে ধাঁধাঁ, মায়া, আলো মোহ, ছলনা, আলোই যন্ত্রণা। তাই বলি অন্ধকারে থেকো। মাতৃগর্ভ অন্ধকার, মৃত্যুতে আত্মসমর্পণ অন্ধকারে ঘোরা। অন্ধকারই নিশ্চিন্ত আশ্রয়। এসো আমরা এই নিশ্ছিদ্র, নিস্তরঙ্গ নিরবধি অন্ধকারে থাকি।" [পৃ. ৩৬০][১২৪]

আরশোলার চোখ দিয়ে গল্পের কথক বর্তমান সময় সমাজকে দেখতে চেয়েছিলেন। এর পাশাপাশি আরশোলাদের মতো জীবদের যৌন জীবন সম্পদে যে সংযম সেই বিষয়ও উল্লেখ করেছেন—'আরশোলার জগতে যখন তখন কেউ মাদীতে খাবল মারে না। ওদের সব সিজিন আছে।' [সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৫৭][১২৫] অতএব মানুষের স্বার্থপরতাময় জীবন থেকে 'শিরদাঁড়া'হীন বুকে ভর দিয়ে হেঁটে চলা আরশোলার জীবনই কথকের কাছে কাম্য বলে মনে হয়েছে।

আমাদের আলোচ্য 'হঠাৎ জোয়ার' ও 'আরশোলা' গল্প দুটিতে গল্পকথকের মনের দ্বৈতসত্তা জেগে উঠেছে। বিশেষ করে 'আরশোলা' গল্পটিতে। আলোচ্য গল্পটিতে গল্পকথকের মনস্বীতার জগতের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। মনের চিন্তা-চেতনার স্তরে এই পরিবর্তনের নাম 'কথাকার' দিয়েছেন 'মেটামরফসিস'। The Metamorphosis অর্থাৎ যাকে চিন্তা-চেতনার the Transformation বলা হয়ে থাকে। চিন্তা-চেতনা পরিবর্তনের মধ্যেই থাকে বক্তা বা কথকের গভীর মনস্তত্ত্ব। সেই গভীর মনস্তত্ত্ব গড়ে ওঠে সামাজিক-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে। যা আমরা আরশোলা গল্পের কথক চরিত্রের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট রূপে দেখতে পাই। শুধুমাত্র 'আরশোলা' গল্পের কথক চরিত্রের মধ্যেই নয়, লেখকের সমস্ত উপন্যাস ও গল্প জুড়ে রয়েছে যুগ সমস্যা, ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিক সত্তার দ্বন্দ্ব ও ব্যক্তিসত্তা-সামাজিক সত্তত্তাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে এবং এই নিয়ন্ত্রণের ফলে উপন্যাস ও গল্পের চরিত্রগুলি আমাদের চেতনায় পরিচিত জগতের বাস্তব ক্ষেত্র থেকে সত্যরূপে ধরা দিয়েছে বলে মনে হয়।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. গৌরকিশোর ঘোষ, প্রতিবেশী, প্রথম সংস্করণ আগস্ট ১৯৯৫, তৃতীয় মুদ্রন জুলাই ২০১২, পৃ. ৩৯।
২. গৌরকিশোর ঘোষ, প্রেম নেই, প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১১৮১, ত্রয়োদশ মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৩৪১।
৩. গৌরকিশোর ঘোষ, প্রতিবেশী, প্রথম সংস্করণ আগস্ট ১৯৯৫, তৃতীয় মুদ্রন জুলাই ২০১২, পৃ. ১৬।
৪. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৭।
৫. গৌরকিশোর ঘোষ, প্রেম নেই, প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৮১, ত্রয়োদশ মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৩৪১।
৬. গৌরকিশোর ঘোষ, প্রতিবেশী প্রথম সংস্করণ আগস্ট ১৯৯৫, তৃতীয় মুদ্রন জুলাই ২০১২, ভূমিকা।
৭. পুষ্পা মিশ্র সম্পাদনা, সিগমুন্ড ফ্রয়েড, এবং মুশায়েরা, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪২১, আগস্ট ২০১৪।

[দ্রষ্টব্য—ফ্রয়েড বলেছেন—অদম, অহং বা অহম এবং শাস্তা পারস্পরিক ক্রিয়াশীল। ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণবাদের সূত্র ধরে মানবমনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।]

৮. গৌতম ভদ্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদনা ঃ নিম্নবর্গের ইতিহাস, প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ১৯৯৮, সপ্তম মুদ্রণ নভেম্বর ২০১২, পৃ. ৬।

৯. গৌরকিশোর ঘোষ, জলপড়ে পাতা নড়ে, প্রথম আনন্দ সংস্করণ মে ১৯৭৮, পঞ্চম মুদ্রণ মে ২০১৩, পৃ. ২২।

১০. গৌরকিশোর ঘোষ, 'উপন্যাস সংগ্রহ, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর।

১১. গৌরকিশোর ঘোষ, জলপড়ে পাতা নড়ে, প্রথম আনন্দ সংস্করণ মে ১৯৭৮, পঞ্চম মুদ্রণ মে ২০১৩, পৃ. ৭১।

১২. সমগ্রন্থ, পৃ. ৭১।

১৩. সমগ্রন্থ, পৃ. ৪৫।

১৪. সমগ্রন্থ, পৃ. ৭০।

১৫. গৌরকিশোর ঘোষ, প্রেম নেই, প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৮১, ত্রয়োদশ মুদ্রম জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ২০০।

১৬. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৮৮।

১৭. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৯৩।

১৮. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৭৪।

১৯. সমগ্রন্থ পৃ. ১৪৬।

২০. সমগ্রন্থ পৃ. ১৪১।

২১. সমগ্রন্থ পৃ. ১৪৬।

২২. সমগ্রন্থ পৃ. ১৪৬।

২৩. সমগ্রন্থ পৃ. ১৪৩।

২৪. সমগ্রন্থ, পৃ. ২২২।

২৫. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৭৪।

২৬. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৭০।

২৭. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৭৪।

২৮. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৮১-২৮২।

২৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৩৪।

৩০. সমগ্রন্থ।

৩১. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৩৬।

৩২. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৩৬।

৩৩. গৌরকিশোর ঘোষ, প্রতিবেশী, প্রথম সংস্করণ আগস্ট ১৯৯৫, তৃতীয় মুদ্রম জুলাই ২০১২, পৃ. ৩১।

৩৪. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৩২।

৩৫. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৩১।

৩৬. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৩১।

৩৭. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৩৩।

৩৮. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৬৯।

৩৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৩৩।

৪০. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৪৩।

৪১. সমগ্রন্থ পৃ. ১৪৩।

৪২. সমগ্রন্থ, পৃ. ৬৭।

৪৩. সমগ্রন্থ, পৃ. ৫২।

৪৪. সমগ্রন্থ. পৃ. ৫৫।

৪৫. সমগ্রন্থ পৃ. ৫৫।

৪৬. সমগ্রন্থ, পৃ. ১১৪।

৪৭. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩২।

৪৮. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৪২।
৪৯. শৈলেশ্বর ঘোষ সম্পাদনা, হাংরি ভেনারেশনের স্রষ্টাদের ক্ষুধার্ত সংকলন, সাতটি প্রতিষ্ঠান বিরোধী সংখ্যা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১১, মাঘ ১৪১৭, পৃ. ৮।
৫০. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৪।
৫১. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান', সাহিত্য সংসদ।
৫২. গৌরকিশোর ঘোষ, উপন্যাস সংগ্রহ, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৯৪, পঞ্চম মুদ্রণ আগস্ট ২০১৩, 'এই দাহ', পৃ. ৯।
৫৩. সমগ্রন্থ।
৫৪. সমগ্রন্থ পৃ, ৪৩-৪৪।
৫৫. সমগ্রন্থ, পৃ. ৫৪।
৫৬. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৬।
৫৭. সমগ্রন্থ, পৃ. ৭৪।
৫৮. সমগ্রন্থ, পৃ. ৫৮।
৫৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ৭৩।
৬০. সমগ্রন্থ, পৃ. ৬৯।
৬১. সমগ্রন্থ, পৃ. ৭৫।
৬২. সমগ্রন্থ, পৃ. ৭৬।
৬৩. সমগ্রন্থ, পৃ. ৭৬।
৬৪. সমগ্রন্থ, পৃ. ৭৭।
৬৫. সমগ্রন্থ, পৃ. ৭৭।
৬৬. গৌরকিশোর ঘোষ, উপন্যাস সংগ্রহ ; প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৯৪, পঞ্চম মুদ্রণ আগস্ট ২০১৩, 'মনের বাঘ', পৃ. ৮২।
৬৭. সমগ্রন্থ, পৃ. ৮৩।
৬৮. সমগ্রন্থ, পৃ. ৮৪।
৬৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ৮৫।
৭০. সমগ্রন্থ, পৃ. ৮৫।
৭১. সমগ্রন্থ, পৃ. ৮৪।
৭২. সমগ্রন্থ, পৃ. ৮৫।
৭৩. সমগ্রন্থ, পৃ. ৮৯।
৭৪. সমগ্রন্থ, পৃ. ১০৯।
৭৫. সমগ্রন্থ, পৃ. ১০৮-১০৯।
৭৬. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৭১।
৭৭. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৪৭।
৭৮. গৌরকিশোর ঘোষ, উপন্যাস সংগ্রহ, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৯৪, পঞ্চম মুদ্রণ আগস্ট ২০১৩, 'লোকটা', পৃ. ১৮৯।
৭৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৮৯।
৮০. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৯১।
৮১. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৯১।
৮২. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৮৩।
৮৩. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৮৭।
৮৪. গৌরকিশোর ঘোষ, উপন্যাস সংগ্রহ, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৯৪ পঞ্চম মুদ্রণ আগস্ট ২০১৩, ''গড়িয়াহাট ব্রিজের উপরে থেকে, দুজনে'', পৃ. ২৩৩।
৮৫. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৩৪।
৮৬. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩০৮।
৮৭. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৯৪।
৮৮. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৯৭।

৮৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৭৭।
৯০. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৭৮।
৯১. সমগ্রন্থ।
৯২. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৬৭।
৯৩. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৬৪।
৯৪. গৌরকিশোর ঘোষ, উপন্যাস সংগ্রহ, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৯৪, পঞ্চম মুদ্রণ আগস্ট ২০১৩, 'এক ধরনের বিপন্নতা', পৃ. ৩১১।
৯৫. সমগ্রন্থ, পৃ. ৪০২-৪০৩।
৯৬. সমগ্রন্থ, পৃ. ৪১১।
৯৭. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৬২।
৯৮. গৌরকিশোর ঘোষ, উপন্যাস সংগ্রহ, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৯৪ পঞ্চম মুদ্রণ আগস্ট ২০১৩, 'কমলা কেমন আছে', পৃ. ৪২০।
৯৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ৪২৯।
১০০. সমগ্রন্থ, পৃ. ৪৩০।
১০১. সমগ্রন্থ, পৃ. ৪৩০।
১০২. সমগ্রন্থ, পৃ. ৪৯৭।
১০৩. সমগ্রন্থ, পৃ. ৪৯৮।
১০৪. গৌরকিশোর ঘোষ, গল্প সমগ্র, প্রথম সংস্করণ মে ২০০৩, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, ভূমিকাংশ।
১০৫. গৌরকিশোর ঘোষ, গল্প সমগ্র, প্রথম সংস্করণ মে ২০৩, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, প্রথম সংস্করণের ভূমিকায়।
১০৬. সমগ্রন্থ।
১০৭. গৌরকিশোর ঘোষ, গল্প সমগ্র, প্রথম সংস্করণ মে ২০০৩, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, 'এই কলকাতা', পৃ. ২০।
১০৮. গৌরকিশোর ঘোষ, গল্প সমগ্র, প্রথম সংস্করম মে ২০০৩, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, 'ম্যানেজার', পৃ. ১২৭।
১০৯. গৌরকিশোর ঘোষ, গল্প সমগ্র, প্রথম সংস্করম মে ২০০৩, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, 'একটি প্রতিশোধের কাহিনী', পৃ. ১০১।
১১০. গৌরকিশের ঘোষ, গল্প সমগ্র, প্রথম সংস্করণ মে ২০০৩, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, 'আগমনী', পৃ. ১১৩।
১১১. সমগ্রন্থ, পৃ. ১১৯।
১১২. গৌরকিশোর ঘোষ, গল্প সমগ্রহ, প্রথম সংস্করণ মে ২০০৩, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, 'জবানবন্দী', পৃ. ১৫০।
১১৩. গৌরকিশের ঘোষ, গল্প সমগ্র, প্রথম সংস্করণ মে ২০০৩, তৃতীয় মুদ্রন ফেব্রুয়রি ২০১২, 'অন্ধকূপ', পৃ. ১৬৭।
১১৪. গৌরকিশোর ঘোষ, গল্প সমগ্র, প্রথম সংস্করণ মে ২০০৩, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়রি ২০১২, 'তলিয়ে যাবার আগে', পৃ. ৩১১।
১১৫. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩২৪।
১১৬. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩১০।
১১৭. সমগ্রনথ, পৃ. ৩২০।
১১৮. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৩১।
১১৯. সমগ্রন্থ পৃ. ৩৩২।
১২০. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৩৫।
১২১. গৌরকিশের ঘোষ, গল্প সমগ্র, প্রথম সংস্করণ মে ২০০৩, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, 'হঠাৎ জোয়ার', পৃ. ৩৫০।
১২২. গৌরকিশের ঘোষ, গল্প সমগ্র, প্রথম সংস্করণ মে ২০০৩, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়রি ২০১২, 'আরশোলা', পৃ. ৩৫৯।
১২৩. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৬১।
১২৪. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৬০।
১২৫. সমগ্রন্থ পৃ. ৩৫৭।